অনুভব

8U1.66R21Ben
ANU-A
1987
30821

আল্লামা ইকবাল সংসদ স্মরণিকা

সৌজন্য সংখ্যা

অনুভব

আল্লামা ইকবাল-এর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা

প্রকাশনায় ঃ
আল্লামা ইকবাল সংসদ-ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রধান সম্পাদক ঃ
মোঃ আঃ ওয়াহিদ

সম্পাদক ঃ
জাফর আহমদ ভূঁইয়া

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ
আল্লামা ইকবাল সংসদ নেতৃবৃন্দ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ
মোঃ মোজ্জাম্মেলুল হক
আজাদ চৌধুরী

মুদ্রণে ঃ
তিতাস প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন, টিপু সুলতান রোড
(রথখোলা) ঢাকা-১

যোগাযোগ ঃ
১৮৬, নবাবপুর রোড (দোতলা),
ঢাকা, বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা মূল্য ২০ টাকা

IQBAL ACADEMY PAK
Library
30821
LAHORE

"ANUVAB" An Allama Iqbal Sangsad Souvenir. Published on the occasion of 49th death anniversary of the Great poet DR. ALLAMA MUHAMMAD IQBAL. Chief Editor : MD. AB. WAHID, Edited by MD. ZAFAR AHMAD BHuiyan. Address : 186, NAWAB PUR ROAD. DHAKA-1 BANGLADESH.

সম্পাদকীয়

মহাকবি আল্লামা ইকবালকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণা চলছে। সম্প্রতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ইকবালের উপর একটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। ইকবালের গুরুত্ব পাকিস্তানে কতোটা দেয়া হয় জানি না। তবে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই ইকবালের চিন্তাধারাকে অনুভব ও অনুধাবনের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশে ইকবাল দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে অনেকটা অপাংক্তেয়, বিভিন্ন মহলে ইকবাল চর্চায় অনীহা লক্ষ্যণীয়। "আল্লামা ইকবাল সংসদ" গঠনের পর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে এ সত্য আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি এবং পাচ্ছি। ইকবাল আজ সকলের নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে। কাব্যের ভুবনে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে যে অবদান তিনি রেখে গেছেন তার মহিমা কালের প্রবাহে সহজে মলিন হবার নয়। ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিপুলভাণ্ডার অনুসন্ধান করে চিন্তার যে উজ্জ্বল রত্ন ইকবাল আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন তা আজো পথ চলতে প্রেরণা যোগায়। বিজ্ঞানের প্রসার যখন আনুষ্ঠানিক ধর্মের ভিত ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হয় তখন আধ্যাত্মিকতার মূল্য নিরূপণে ইকবালের দার্শনিক ভাবনা বিরাট অবদান রাখে। এ-জন্যে ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেই ইকবালের কাছে ঋণি। মুসলমানদের বিজয় গৌরব যে সময় স্তিমিত, গোটা মুসলিম জাহান যখন শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক চেতনায় পশ্চাদপদ, অধঃপতিত এবং হতাশাগ্রস্ত, তখন ইকবাল এসে মুসলমানদের কাছে আশার বাণী শোনালেন। অধঃপতনের কারণগুলো সনাক্ত করলেন। খুদীর মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করলেন। ইকবালের প্রেরণায় উজ্জীবন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রে দীক্ষা নিলো মুসলিম সমাজ। ইকবালের কাব্যচর্চা এবং দার্শনিক চিন্তা দু-ই ছিলো প্রচণ্ডভাবে উদ্দেশ্যমুখী। আর সে উদ্দেশ্য হলো ইসলামী চিন্তার আলোকে সমাজকে সুবিন্যস্ত করা। পাশ্চাত্যের লাগামহীন ভোগবাদী দর্শন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী নাস্তিকতাবাদী কম্যুনিস্ট দর্শনের ত্রুটি নির্দেশ করে ইকবাল ইসলামের ভারসাম্যমূলক জীবন-দর্শনকে আধুনিক মানুষের সামনে বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত করেন। ইকবাল নিজেকে কখনো নতুন দর্শনের উদগাতা বলে দাবী করেননি। ইসলামী দর্শনকেই স্বীয় অনুভবের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। ইকবাল চিন্তার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন তার চর্চা ও অনুশীলন অব্যাহত থাকলে মুসলমানদের পথভ্রষ্ট হবার কথা নয়। ইকবালের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা তাঁকে নতুন করে স্মরণ করছি আমাদের চিন্তায় ও প্রতিজ্ঞায়।

সৌজন্য সংখ্যা

শুভেচ্ছা বাণী

ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম মানসপুত্র এ উপ-মহাদেশের ক্ষণজন্মা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, ডক্টর, আইনবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুসলিম জাতীয়তাবাদের তুর্যবাদক বিশ্ববিশ্রুত কবি আল্লামা ইকবালের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে "আল্লামা ইকবাল সংসদ" একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রায় দেড় যুগ ধরে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মানসিক সংকীর্ণতার কারণে আমাদের দেশে ইকবাল চর্চা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুপস্থিত ছিলো। এতে আমাদের যে জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইকবালের কালাম আমাদের স্মরণযোগ্য। এই উপ-মহাদেশের দিশেহারা মুসলিম সম্প্রদায়কে ইকবাল মসীর মাধ্যমে যে উপঢৌকন দিয়ে গেছেন তা মুসলমান মাত্রেই বিস্মৃত হবার নয়। মানুষ আজ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির অন্বেষায় উন্মুখ, এমনি এক পরিস্থিতিতে মহাকবি ইকবালের চিন্তাধারা ও আদর্শ নিঃসন্দেহে পথহারা মানুষের আলোকবর্তিকারূপে পথ দেখাবে—আমি বিশ্বাস করি। এই সংসদ ইকবালের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাহিত্য চর্চার নতুন পথ করে দেবে, এই প্রত্যাশায় আমি উদ্যোক্তাদের জানাই মোবারকবাদ। আমি এই মহতী প্রয়াসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মোহাম্মদ কোরবান আলী
বার-এট-ল ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহাকবি ইকবালের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে "আল্লামা ইকবাল সংসদ"-এর মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে যাঁরা লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, আর্থিক দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক

ইকবালের ইতিহাস-দর্শন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মরহুম আল্লামা ইকবালকে প্রচলিত ভাষায় ব্যবহৃত কবি বলা যায় না। তিনি কবিদের মত শুধু তাদের ধ্যানের ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত জগতের বর্ণনা দিয়েই তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেননি। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত আদর্শিক জগতকে প্রতিষ্ঠিত করতেও ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে নবী মুর-সালদের আদর্শের সঙ্গে যোগ রয়েছে। ওঁদের কাছে ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সত্যকে শুধুমাত্র লাভ করা নয় সে সত্যের আলোকে জগতকে পুনর্গঠন করা। ইকবালও এ-জন্যেই Reconstruction of Religious Thought in Islam নামক তাঁর চিন্তাধারার সংকলনে কেবলমাত্র ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনই প্রয়োজনীয় মনে করেননি। ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনের সঙ্গে জাগতিক চিন্তারও পুনর্গঠন কামনা করেছেন। এ-জন্য তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে এ-বিশ্বের বিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার করে তারই আলোকে বিশ্বসভ্যতার গতি নির্দেশ করতে চেয়েছেন। তাঁর সাধনার এ ধারাতে ইতিহাস-দর্শনের এ পর্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর সময়ে যা এখনও ইতিহাস-দর্শনের চর্চা এ দুনিয়ায় বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়নি। মার্কসবাদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস-দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে স্থান পেয়েছে মাত্র, তবুও তত্ত্বীয় জ্ঞানের প্রসারের মতো তা এখনও তেমন বিস্তৃত লাভ করেনি। তিনি তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির আলোকে সে জ্ঞানের অপরিহার্যতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। এ দর্শনের প্রবক্তা ইবনে খলদুনের পরবর্তী ভাইকো, ক্যান্ট, হারডার, হিগেল, মার্কস প্রমুখ দার্শনিকদের মতো তিনি শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির আলোকে বিশ্ব ইতিহাসের গতির ব্যাখ্যা করেননি, তবুও এ সম্বন্ধে তাঁর প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তকে মানব মানসে নতুন আলোকপাত করতে সমর্থ বলে গ্রহণ করা যায়। তার প্রধান কারণস্বরূপ বলা যায়, তিনি

কুরআন-উল-করীমকে পাঠ করেছেন বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে। যেহেতু তিনি যেমন ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ (Theologian) তেমনি ছিলেন একজন দার্শনিক (Metaphysician)। এ-জন্য এ প্রসঙ্গে তাঁর মতবাদ এক অভিনব আলোক বিচ্ছুরণকারীরূপে দেখা দিয়েছে। ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে তিনটি উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায়—(১) প্রথমতঃ তার বিবর্তন সম্বন্ধীয় ধারণা থেকে, (২) রাজনৈতিক ধারণা থেকে ও (৩) ইসলামের গতি সম্বন্ধে তার ধারণা থেকে।

সেকালের জীব-বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদকে সত্যিকার ধারণা বলে গ্রহণ করলেও বর্তমানকালে ডারউইন প্রবর্তিত বিবর্তনবাদের সত্যতা নানা বিতর্কের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ডারউইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দুনিয়ায় মানুষের অবতরণকে বৈজ্ঞানিক সূত্রে প্রকাশ। এ অবতরণ থেকে যে আরোহণও সম্ভবপর এবং তার ধারা অনন্তকালব্যাপী সম্ভবপর তার কোন উল্লেখ তিনি করেননি। বিবর্তনের পরিণতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জটিলতারূপেই। তার মতানুসারে ক্রমবিকাশের ধারা এতে সরলাবস্থা থেকে জটিলাবস্থায় উপনীত হয়।

এতে ভাববার বিষয় এই—মানবিক স্তরে উপনীত হলে এতো সহজে মানব-জীবনের সব কিছুর ব্যাখ্যা করা যায় না—মানবিক স্তরে এমন কতকগুলো বিষয় প্রতিভাত হয় যাদের উদ্যম, উদ্যোগ প্রভৃতি চিন্তার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হয়। শুধুমাত্র অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, উপযুক্ততমের উর্ধ্বতন প্রভৃতি চিন্তার মাধ্যমের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এ দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা ক্ষেত্রে উন্নতি কিভাবে দেখা দেয় তার উত্তর ডারউইন দেননি। তার পূর্বে জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানব-জীবনে সামাজিক ও অসামাজিক বলে দু'টো বৃত্তি রয়েছে কার্যকরী। এ দু'য়ের দ্বন্দ্বের ফলে মানব-সভ্যতা অগ্রসর হয়। তার পরবর্তী চিন্তানায়ক হারডার কেবলমাত্র মানস-জাত প্রবণতাকেই ক্রম-বিকাশের কারণ হিসেবে গ্রহণ করেননি, তার সঙ্গে ভৌগলিক ও জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কারণগুলোকেও ধর্তব্য গণ্য করেছেন।

এতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ক্যান্ট যে ধারণা পোষণ করতেন তাতে ইতিহাসের ধারা একটা উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ধেয়ে চলছে। হারডারও বিবর্তনের পশ্চাতে একই সাংগঠনিক শক্তি স্বীকার করেছেন।

তবে, সাংগঠনিক শক্তিকে হারডার পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেননি এবং তার মাঝে কোন উদ্দেশ্য বিরাজমান বলেও স্বীকার করেননি।

বর্তমানকালে ইকবালই সর্বপ্রথম হারডারের সে অসমাপ্ত কাজ গ্রহণ করে বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ ও তার লক্ষ্য পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ক্যান্ট ও হারডার প্রকৃতিতে কোন জ্ঞানের সন্ধান পাননি। তাই তাকে নিউডান বলে ধারণা করেছেন। ইকবাল প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ চেতনাময় সত্তার সন্ধান পেয়েছেন এবং এ সজ্ঞান সত্তাকেই সাংগঠনিক শক্তি বলে স্বীকার করেছেন। ইকবালের মতে, এ পৃথিবীর সত্তা একটা সর্বশক্তিমান চৈতন্য। সে চৈতন্য তার নিজের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সজ্ঞান। এ সত্তাকেই তিনি আত্মচৈতন্য নাম দিয়েছেন এবং এটিই এ জগতের স্রষ্টা। এ সৃষ্টিধর্মী শক্তির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের বিকাশ। তার গতিশীলতার শক্তি হচ্ছে প্রেম। এ গতির আনুসঙ্গিক অপর প্রবৃত্তি হচ্ছে ঘৃণা। তার ফলে এ গতিশীলতার শক্তি সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দুইভাবেই দেখা দেয়। এতে জড় পদার্থ সংক্রান্ত সবগুলো নীতিই প্রকাশ পায়। এ পর্যায়ে জড় পদার্থে এমন পরিপূর্ণতা দেখা দেয় যে, তা থেকে প্রথম জীব কোষের সৃষ্টি সম্ভব হয়। যেহেতু জীব তার এ সহজাত আকর্ষণ ও বিকর্ষণতার কাজকর্ম প্রকাশ করে এজন্যই তার জৈবিক সংগঠন জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করে এবং সংগঠনের ব্যাপারে আরও দৃঢ় হয়। অবশেষে এ দুনিয়ার সংগঠনের ক্ষেত্রে সহজাত সবচেয়ে বেশী জটিলতর হয়ে মানব জাতি দেখা দেয়। তাতে তার সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা ও গুণাবলী আরও বৃদ্ধি পায়। জীবন্ত প্রাণী তাদের সহজাত কামনা-বাসনা ও উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্যে যতই চেষ্টা করতে থাকে তাদের সংগ্রামের ফলে বিশ্বাত্মার পরিচালিকা শক্তির আরও স্ফুরণ হয়। তবে, পরিণতিতে আরও শক্তির বিকাশ হয়। এভাবেই সাধনার দ্বারা পাখীর ডানা গজায়, তারা উড়তে পারে, পাখীরা হাঁটতে পারে। মানুষের মধ্যে জীবন আবার তার শক্তি খুঁজে পায় এবং আত্মজ্ঞানের গুণাবলীর সন্ধান লাভ করে। বিবর্তনের পক্ষে সংগ্রাম প্রয়োজনীয় বলার অর্থ হচ্ছে—জীবন প্রতি পদক্ষেপেই নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলো অতিক্রম করে তাকে চলতে হয়। কারণ, জীবনের প্রবৃত্তি কেবল রক্তে পর্যবসিত নয়, স্মৃতি রক্ষণার্থেও নিয়োজিত। জীবন কেবল লক্ষ্যের রূপায়ণেই যুক্তি প্রয়োগ করে না, যে সব লক্ষ্যে সে পূর্বে পৌঁছে গেছে সেগুলোর প্রতিরক্ষা বিধানে ও সংরক্ষণেও তৎপর হয়। আদর্শ সংক্রান্ত

পর্যায়েও বিবর্তন কার্যসীন থাকে। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক আইন-কানুন থেকেই সে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় না। যেসব সহজাত প্রবৃত্তিকে বিকাশের জন্য জীবন লালন-পালন করেছিল সেগুলো তার প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী কওমের সবগুলো আদর্শও তাতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

এ পর্যায়ে প্রত্যেক আদর্শপরিচালিত কওম কেবলমাত্র প্রাকৃতিক রীতি-নীতি থেকে নয়, বা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে নয়, সমসাময়িক আদর্শপরিচালিত কওমের পূর্ববর্তী উদ্দেশ্য থেকেও নানা প্রতিবন্ধতার সম্মুখীন হয়। আদর্শ-পরিচালিত কওমের এ সংগ্রাম পরিচালিত হয় তার আদর্শের অন্তর্গত উহ্য শক্তি থেকে এবং ক্রমে কওমের জীবনে তা রূপায়িত হয়। সময়ে তা আবার স্থিতিশীল, স্বয়ংক্রিয় ও স্থায়ীরূপ ধারণ করে এবং কওমের সংবিধানরূপে নাগরিক ও সামরিক আইনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ পর্যায়ে যদি সেই কওমের অন্তর্গত লোকেরা পরবর্তী উচ্চতর আদর্শের জন্যে একে পরিত্যাগ করতে চায় তা হলে তাদের পক্ষে প্রচলিত আইনের প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস করার জন্য আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। যদি এতে তারা সফল হয় তা হলে তাকে বলা হয় বিপ্লব অন্যথায় বলা হয় বিদ্রোহ।

এ-ক্ষেত্রে ইকবাল দুনিয়ার বা ইতিহাসের গতি প্রসঙ্গে তার যে লক্ষ্যের উল্লেখ করেছেন তাতে রয়েছে কুরআন করীমের দর্শন। কুরআনের মধ্যে যে তার উল্লেখ রয়েছে তাতে বলা হয়েছে—এ বিশ্ব চরাচর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনসান-ই-কামিল সৃষ্টি করা। তাই দুনিয়ায় রয়েছে সে ইনসান-ই-কামিল সৃষ্টি করার এক প্রস্তুতি। তাই ইতিহাস-দর্শনে তার এ মতবাদ একটা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি ডারউইন বা লেমার্কের মত এ দুনিয়ায় সর্বত্র একটা সংগ্রামের সন্ধান পেয়েছেন। তারা এ সংগ্রামকে জীবজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ইকবাল জড়জগতের মধ্যেও তার সন্ধান পেয়েছেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি এ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে সততই সংঘাত ও সংগ্রামের দৃশ্য অবলোকন করেছেন—তার মূলে যে মানবজীবনে অবস্থিত নানাবিধ প্রতিকূলবৃত্তি বর্তমান তার উল্লেখ করেছেন। মানবজীবনের বিকাশের ধারাতে এসব প্রতিকূলবৃত্তির কার্যকারিতাও স্বীকার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এসব সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মূলে যে বিশ্ব-চেতনা বর্তমান তারও উল্লেখ করেছেন। এ বিশ্ব-চেতনার যে লক্ষ্য রয়েছে তা বিবৃত করে বলেছেন, বিশ্বচেতনার লক্ষ্য জাতীয়তাবাদের

বিষময় পর্যায়ে থেকে মানুষ যখন আন্তর্জাতীয়তার পর্যায়ে আরোহণ করবে তখনই এ জগতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইকবালের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, জাতীয়তাবাদ থেকে এ দুনিয়ায় যতসব অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়েছে। তাই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন, মানুষ প্রশ্ন করে প্রগতির ও সভ্যতার বিবর্তনের কি এখানেই ইতি? মানুষ মানুষকে ঘৃণার বশবর্তী হয়ে খুন করছে এবং দুনিয়ার মানুষের আবাসস্থল মানুষের পক্ষে অযোগ্য হয়ে উঠেছে! আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, মানবজাতিকে শ্রদ্ধা করেই মানুষ এ দুনিয়ায় বাঁচতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের শক্তি ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি নিয়োজিত না হয়, তাহলে এ দুনিয়া ভয়ানক জন্তু-জানোয়ারের যুদ্ধস্থলে পরিণত হবে। রক্ত, জাতীয়তা, ধর্ম ও ভাষার ঊর্ধ্বে অবস্থিত মানুষের ঐক্যই একমাত্র প্রত্যয়ের মূল। যতদিন পর্যন্ত তথাকথিত প্রজাতন্ত্র, এই অভিযুক্ত জাতীয়তাবাদ এবং অনুন্নত সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ না করা যায়, যতদিন না তাদের কার্যকলাপে এ দুনিয়াকে আল্লার পরিবার বলে প্রমাণ না করে, যতদিন পর্যন্ত রক্ত ও ভৌগোলিক সীমাসম্ভূত জাতিগুলো এ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত তারা সুখী ও তৃপ্তিপূর্ণ জীবনযাপনে সমর্থ হবে না। ফলে, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মধুর ধারণাগুলো রূপায়িত হবে না।

কেবলমাত্র ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের মারাত্মক ভাবধারা নয়—তথাকথিত প্রজাতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও এ দুনিয়ার শ্রদ্ধা দুনিয়ার সর্বশেষ লক্ষ্যে পৌঁছার গতিতে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। জীবনের সর্বোচ্চমানের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন যে প্রজাতন্ত্রকে বর্তমানকালে এত ঊর্ধ্বে তোলা হয়েছে তা মস্তক গণনার ব্যাপারেই পর্যবসিত এবং সে মস্তকের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের ধারণা বা জাতীয় স্বার্থলাভের আকাংক্ষা। জীবনের উচ্চস্তরের মানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন প্রজাতন্ত্র, ইকবালের কাছে মস্তক গণনার অন্ধ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যতীত কিছুই নয়। এতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচার, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের একটা সাধারণ কারবারে পরিণত হয়।

ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলামী অর্থনীতি

এ, এফ, এম, হোসাইন আহমদ

অর্থনীতি মানবজীবনের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানবতার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অর্থনীতিকে কোন অবস্থায় অবহেলা করা উচিত নয়। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি অর্থনৈতিক মতবাদ, যা বর্তমান বিশ্বকে দু'টি শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছে। প্রথমতঃ পুঁজিবাদী শিবির এবং দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে সমাজবাদী শিবির। পুঁজিবাদ ইসলাম পূর্বযুগ থেকেই চলে আসছে আর উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কার্লমার্কস সমাজবাদের কথা প্রচার করেন। গোটা মুসলিম দুনিয়া ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জলাজলী দিয়ে উপরোক্ত দু'টো শিবিরের যে কোন একটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। এ দু'টো শিবিরের যাঁতাকলে পড়ে বর্তমান বিশ্ব, বিশেষকরে মুসলিম জাহানসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে।

মুসলিমবিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রাচ্যের দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলাম নিছক কোন ধর্ম নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধান (Coumplete Code of life)। তাই ইসলামের সমাজ-দর্শন, রাজনৈতিক-দর্শন এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতি-দর্শনের ন্যায় ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনকেও আল্লামা ইকবাল মানবজীবনের জন্য এক অপরিহার্য দর্শন বলে বিশ্বাস করতেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহ যেমন 'রূহ' বা 'আত্মা'র উন্নতির সাথে সাথে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শান্তি নিশ্চিত করে, তেমনি ইসলামী অর্থনৈতিক মতাদর্শ ও জাগতিক উন্নয়নের সাথে পারলৌকিক মুক্তিতে প্রত্যক্ষ সহায়ক শক্তি বলে আল্লামা ইকবালের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি বার বার ইসলামী অর্থনীতির কথা বলেছেন এবং এর বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা-সাধনাও করেছেন। আল্লামা ইকবালের এ মতাদর্শ ও চিন্তাধারা শুধুমাত্র সূফীবাদ বা মৌলবাদীদের নয়, বরং সর্বস্তরের প্রগতি-

বাদীদেরকেও প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে এবং সকলের মন-মেজাজে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করেছে।

আধুনিক যুগকে ইউরোপীয় দর্শন ও সভ্যতার যুগ বলা হয়ে থাকে। মুসলিম দুনিয়ার অনেকের মনে বর্তমান যুগে ইসলামী রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি—বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কে অহেতুক সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করেছে। আধুনিক শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত "ডক্টর" এবং আইনশাস্ত্রে "বার-এট-ল" হওয়া সত্ত্বেও আল্লামা ইকবাল ইসলামী আদর্শ ও দর্শন হতে বিন্দুপরিমাণও বিচ্যুত হননি। কারণ, ইকবাল ছিলেন ইসলামী আদর্শে আদর্শবান ও একজন নিষ্ঠাবান মর্দে মু'মিন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলাম প্রদত্ত অর্থনৈতিক সমাধানের উপর ইকবালের বিশ্বাস ছিল অটুট। তাই আল্লামা ইকবাল সর্বস্তরের জনগণকে কোরআন ও হাদীসের আলোকে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

এটা নিরেট সত্য যে, পাশ্চাত্য-দর্শন ও চিন্তাধারা মুসলিম জাহানের ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তাধারাকে যথেষ্ট ব্যাহত করেছে। ফলে, মুসলিম দুনিয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এহেন অবস্থায় অন্যান্য মুসলিম চিন্তাবিদের ন্যায় আল্লামা ইকবালও ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী আদর্শকে সমন্বিত রাখার জন্য বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্য-সাহিত্য এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় ইসলামী অর্থনীতির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লিখনী এবং দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত, সেদিকে নব্য ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। এভাবে আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাহানসহ প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের জনগণকে ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

আল্লামা ইকবাল লাহোর সরকারী কলেজে অধ্যাপনার সময় অর্থনীতি (Economics)-এর উপর উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম একটি বই (ইলমুল ইকতিসাদ) লিখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল্লামা ইকবাল যেহেতু ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির প্রবক্তা ছিলেন তাই তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা-

ধারায়ও ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। ইকবাল পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে মোটেই সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানবসমাজের জন্য এক মারাত্মক রোগ। এ ব্যবস্থায় মানবতা লাঞ্ছিত হয়, নৈতিক অধঃপতন হয়, সর্বপরী অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়ে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বার্থপরতা, সম্পদ লুণ্ঠন ও উদর ভর্তির চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে এ চরিত্র মানবজাতির নয়, বরং এটা হচ্ছে জীব-জন্তু ও পশু-পাখীর চরিত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানবসমাজ চরম ধনী ও চরম গরীব, এই দু'টো সমাজে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে, জাতীয় জীবনে অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। ইয়াতীম, অসহায়, বিকলাংগ ও অন্যান্যের ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হয় না। পাশ্চাত্য দর্শন ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রভু ও দাসের জন্ম দেয়, যা মানবতাকে হেয়প্রতিপন্ন করে তোলে। তাই তো আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

"تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے"

অর্থাৎ, "মনিব ও চাকরের পার্থক্য মানবতাকে ধ্বংস করে দেয়।" তিনি আরো বলেনঃ "مغربی تہذیب اپنی آپ خودکشی کر لیگی"

'পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থ হচ্ছে আত্মহত্যা।' এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লামা ইকবাল পাশ্চাত্য দর্শন ও পুঁজিবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, অর্থনীতি মানবজীবনের একটি মৌলিক অধ্যায়। "সম্পদ মানুষের জন্য কিন্তু মানুষ সম্পদের জন্য নিশ্চয় নয়"। এ দার্শনিক চিন্তাধারাকে সামনে রেখে আল্লামা ইকবাল বলেন যে, অর্থনৈতিক জীবনের সাথে নৈতিকতা ও চারিত্রিক বিধানের সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন, যা একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, আর্থিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সমাজবাদের জন্ম তা হচ্ছে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী একটা মতবাদ। এ মতবাদের সাথে ইসলাম তথা মানবতার কোন নিকটতম সম্পর্কও থাকতে পারে না। সমাজবাদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী সমাধানও নয়। এ মতবাদে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের এক বিকল্প সমাধান চিন্তা করা হয়েছে। এতে আত্মা, পরকাল ও ইসলামী জীবনাদর্শের কোন কথা নেই। বস্তুতঃপক্ষে, সমাজবাদ নাস্তিকতার অপর নাম। সুতরাং এ মতবাদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান তো সম্ভবই নয়, বরং নতুন নতুন বহু সমস্যা সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক জীবন-

ধারাকে আরো জটিল করে তোলে। আল্লামা ইকবাল বলেন, "যে শ্রমিক রাজের কথা বলে সমাজবাদের জন্ম, তা সম্পূর্ণ একটা শ্লোগানসর্বস্ব মতবাদ।" এ মতবাদে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির নামে প্রথমে মুখভরা কথা এবং পরে প্রত্যক্ষ আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ শ্রমিকের হাতে কোনদিন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন ক্ষমতাই আসে না। বরং কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতেই দেশের সম্পদ ও রাজশক্তি কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে, মানুষ তার মনুষ্যত্ব ও স্বাধিকারকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তার কোন নাম-নিশানা আর বাকী থাকে না। আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

"زمام کار مزدور کے ها تهه انا ایک حیله هے"

অর্থাৎ "কাজকর্মের কর্তৃত্ব শ্রমিকের হাতে আসা একটা ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়।" অন্য কথায়, সমাজবাদ মানুষ ও মানবতাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিকট চিরতরে বন্দী করে ফেলে। সমাজবাদী সমাজে ব্যক্তিসত্তা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধিকার চিন্তা ও ভাবনার আজাদী বলতে কিছুই থাকে না। এ সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে আল্লামা ইকবাল খাদ্যজীব হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন ঃ

ای طائر لاهوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی هو پرواز مین کوتاهی

'হে উর্ধ্বে ভ্রমণকারী পাখী, ঐ খাদ্য থেকে মৃত্যু ভাল, যে খাদ্য তোমাকে উড়তে বাধা সৃষ্টি করে'।

পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ যে কোন অর্থনৈতিক মতবাদের পেছনে যেহেতু ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন নেই, তাই কবি উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কবি মনে করেন যে, ইসলামী মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজ হচ্ছে একটি আদর্শ সমাজ বা Ideal Society। আর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া ideal Society গড়ে উঠতে পারে না। তাই ইসলাম মানুষকে এমন একটি অর্থনৈতিক মতবাদ দিয়েছে যার পূর্ণ বাস্তবায়নে সমাজে ধনী-গরীবের মধ্যে চরম পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। ভ্রাতৃত্ব ও মানবকল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিতহবে সে সমাজের ভিত্তি। ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, "کاد الفقران یکون کفرا"

"দারিদ্র্যতা মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়"। অতএব, এহেন দারিদ্র্যতা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন একমাত্র নির্ভুল উপায়।

১৯৩৮ সালের কথা। ইকবাল জীবনসায়াহ্নে অসুস্থ। সে সময়ের কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত নেহরু আল্লামা ইকবালের সাথে দেখা করতে এলে মহাকবি ইকবাল কংগ্রেস সভাপতিকে কংগ্রেসের ভ্রান্তনীতির জন্য সাবধান করে তিনি স্পষ্ট করে বল্লেন, "কংগ্রেসের সমাজবাদী নীতি ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি কোন দিন আনতে পারবে না"। বস্তুত ইকবালের চিন্তা-ধারাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই, ইকবাল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ "পেটের জন্য" সমাজবাদের এ ভ্রান্তনীতিকে গ্রহণ করেননি। কাজেই যে বাসস্থান দুর্বল শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত তা যেমন স্থায়ী হতে পারে না, তেমনি পেটের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদও মানবকল্যাণ আনতে পারে না। অতএব, আল্লামা ইকবাল-এর দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে "ইসলামী মতাদর্শের" কোন বিকল্প নেই।

আল্লামা ইকবালের বিপ্লবী চিন্তাধারা

জুলফিকার আহমদ কিসমতী

বিশ্বকবি ডক্টর আল্লামা ইকবাল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, দার্শনিক, সংস্কারক, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আইনবিদ ও রাজনীতিবিদ। মূলত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাই এই উপ-মহাদেশের রাজনীতির দিক পরিবর্তন ঘটায়। অবশেষে তাঁর এ চিন্তাধারা এখানে আনে ভৌগলিক পরিবর্তন। কবি আলতাফ হোসাইন হালি, শিবলী এবং আকবর এলাহাবাদী, স্যার সৈয়দ উপ-মহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানদের জাগাবার জন্য কবিতার মধ্যদিয়ে এবং অন্যভাবে যে কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, আল্লামা ইকবালের মাধ্যমে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। বস্তুত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী মুসলমানদের মধ্যে যে সকল ব্যাধি চিহ্নিত করেছিলেন, সংস্কারধর্মী চিন্তা নিয়ে তারপর সেই ব্যাধির আরও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম স্তরসমূহ কবি আল্লামা ইকবালই আবিষ্কার করেন। শুধু আবিষ্কারই নয়, উক্ত ব্যাধির হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় কবি ইকবাল তাও নির্দেশ করে গেছেন। কবি ইকবাল একটি "জাহানে নও" নতুন জগত ও আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজ যখন ইসলামী সম্মেলন সংস্থা 'মো'তামার-এ-আলামে ইসলামী' 'রাবেতা-এ-আলামে-এ-ইসলামী' ধরনের আন্তর্জাতিক ইসলামী ঐক্য সংস্থার কথা শুনি তখন ইকবালের ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠন বা বিশ্ব মুসলিম ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের কথা স্মরণ না করে পারি না।

আল্লামা ইকবালই সর্বপ্রথম বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের পথিকৃৎ জামালুদ্দীন আফগানীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং উপ-মহাদেশের মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাসভূমি ছাড়াও মুসলিম জাহানের সমন্বয়ে একটি ব্লক গঠনের ধারণা দেন। তিনি বলেছেন "এক হো মুসলিম হেরম কী পাসবানী কে লিয়ে নীল কে সাহেল ছে লে কর তা বখাকে কাশগর"। অর্থাৎ, কা'বা শরীফের মর্যাদা

রক্ষার্থে নীলনদের তীর হতে চীনের সুদূর কাশগর পর্যন্ত সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এক কথায়, কবি ইকবাল পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সারা বিশ্বকে যখন দু'ভাগে বিভক্ত দেখেছেন, তখন তিনি উক্ত দুই মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মতের অনুসারীদের নিয়ে তৃতীয় শিবিরের কথা চিন্তা করেছেন।

বলা বাহুল্য, ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে কবি ইকবাল হিমালয়ান উপ-মহাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব পেশ করেন, সেটি ছিল মূলতঃ তাঁর পরিকল্পিত মুসলিম রাষ্ট্র সংঘেরই প্রথম পদক্ষেপ। মুসলিম জাতীয়তাবাদ নতুন কোনো মতবাদ ছিলো না বটে, তবে দীর্ঘ দিনের মিলনধর্মী রাজনীতির আবর্তে সে ধারণাটি যেন ক্ষীণ হতে যাচ্ছিল। আল্লামা ইকবালের চিন্তা তাকেই চাঙ্গা করে তোলে। ইকবাল যে দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিরূপে আখ্যায়িত করতেন সেই অভিন্ন চিন্তা থেকেই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেছেন। ইকবাল মুসলিম জাতি সত্তা গঠনের অতীত উপকরণের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। তাই বলে তিনি প্রতিক্রিয়াশীলতার শিকার হননি। বরং অতীতের মূল্যবান উপকরণ এবং সফলতা ও ব্যর্থতা থেকে অভিজ্ঞতার মাল-মশলা দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে একটি গতিশীল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করার সাধনাই করে গেছেন। এ জন্য দেখা যায়, তিনি একদিকে মুসলিম যুবকদের নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের প্রতি তাকাতে আহবান করেছেন আবার সাথে সাথে উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার জন্যে ডেকে বলেছেন ঃ

আমল ছে যিন্দেগী বনতী হায় জান্নাত ভী জাহান্নাম ভী
ইয়েহ খাকী আপনী ফিৎরত মে
না নূরী না নারী হায়
"কর্মই গড়ে মানুষের জীবন, কর্ম গড়ে
জান্নাত আর জাহান্নাম
জন্মেনা ধূলার মানুষ
শয়তান আর ফেরেশতা বেশে।"

দার্শনিক ও চিন্তানায়ক ইকবাল জাতির পতনোন্মুখ অবস্থা লক্ষ্য করে প্রথমে তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে ব্রতী হন। জীবনের প্রতি আস্থাহীন

হতাশাগ্রস্ত জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করার জন্যে তিনি প্রথমে শক্তিহীন ও কর্মহীনরূপে সৃষ্টিকারী সূফীবাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কারণ, এরূপ সূফীবাদকে তিনি কোরআনে বর্ণিত 'জেহাদ'-এর মূল দর্শন বিরোধী মনে করতেন। তিনি তকদীরবাদেরও নতুন ব্যাখ্যা দান করেন। ইউরোপ অবস্থানকালে ইকবাল "আধ্যাত্ম দর্শনের ক্রমবিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ সময় তিনি মুসলিম সূফীবাদের উপর গবেষণা করেন। তাতে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে যখন অনারব এলাকায় বিস্তার লাভ করে তখনই প্রকৃত ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে অনেক অনৈসলামী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। তখনই কোরআন-সুন্নাহর মূল লক্ষ্যের বাইরে মুসলমানরা এক-প্রকার সূফীবাদ তথা মায়াবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহতে নিন্দিত "রাহবানিয়াত" (সংসার ত্যাগের) ভাবধারার জন্ম নেয়, মুসলমানরা কালের প্রবাহের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়ে সূফীবাদের আশ্রয় নেয়। তারা কাজ করে এবং কিছু না পেয়েও মানসিক সান্ত্বনা লাভের পন্থা তালাশ করে। তাদের কথা হলো, জীবন ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ ছাড়া সবকিছু মায়া। চেষ্টা-তদবীর করে কোন লাভ নেই। তকদীরে যা লিখা তা-ই হবে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো। আল্লামা ইকবালের মতে, কর্মবিহীন এহেন তাওয়াক্কুল কোরআনে বর্ণিত তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। তাই তিনি বলে উঠলেন :

"খুদী কো কার বুলন্দ ইৎনা কেহ হর
তাকদীর ছে পহলে
খোদা বন্দে ছে পুঁছে বাতা তেরী
রেযা কেয়া হায়ে।"

"তুমি আপন আত্মা ও ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে সুদৃঢ় করে তোলো যেন আল্লাহ তকদীর সৃষ্টির পূর্বেই নিজে তোমাকে জিজ্ঞেস করেন বলো বান্দা, তাকদীর কি রকম হলে তুমি খুশি হও।"

ইকবাল সূফীদের সংসার বিমুখিতা এবং মায়াবাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান চালিয়ে গেছেন। জীবন ও জগতের রহস্য বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বস্তুজগত মায়া নয়। এটা বাস্তব। মানুষের উন্নত ব্যক্তিত্ব (খুদী) সকল লয়ের উর্ধ্বে। উন্নত আত্মা স্থায়িত্বের অধিকারী। ইহজগত

থেকে এর প্রস্থান সাময়িক। আত্মিক শক্তিকে কর্মের দ্বারা যে যত বেশী শক্তিশালী করবে সে ইহ ও পরকালে ততধিক মর্যাদার অধিকারী হবে। ইকবালের মতে, জীবন-মরণের সংগা আলাদা প্রাণ থাকলেই জীবন হয় না। মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে প্রাণ বিসর্জন করাই প্রকৃত জীবন। মানবাত্মার জাগরণে ইকবালের তাকদীর সংক্রান্ত ব্যাখ্যার বিরাট অবদান রয়েছে। তাকদীর পূর্ব থেকেই আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত ইকবাল তা সরাসরি স্বীকার করেন না। এ অজুহাতে দুর্বলমনা লোকেরা কষ্ট-পরিশ্রম এবং বিপদ-আপদের ঝুঁকি থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। তিনি এ ধারণা পরিবর্তনকল্পে তাকদীর সম্পর্কে যা বলেন তা হলো, মানুষের কাছে যদি কোন তাকদীর পছন্দনীয় না হয়, সে আল্লাহর কাছ থেকে অন্য তাকদীর বেছে নিতে পারে। কারণ, তাঁর কাছে রয়েছে অসংখ্য তাকদীর। তদবীর ছে তাকদীর টলতী হ্যায়—"কর্ম ও চেষ্টা-পরিশ্রমের পর তাওয়াক্কুল করার মধ্যদিয়ে তাকদীর পরিবর্তন হয়" ইকবালের কথার তাৎপর্য এটাই। ইকবালের মতে, মু'মিন কোন সময় তাকদীরের অধীন নয়। বৃক্ষলতা, জড়বস্তুই তাকদীরের অনুগত। মু'মিনের কর্ম ও ইচ্ছা অনুসারেই আল্লাহ তার তাকদীর সৃষ্টি করেন।

ইকবালের কথা হলো, তাকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ অর্থহীন। তুমি নিজেই কর্মের পর তাওয়াক্কুলের দ্বারা তাকদীর রচয়িতা হলে না কেন? এমনিভাবে তিনি তাকদীরের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে নিজের ক্ষুরধার লেখনী চালিয়ে মুসলিম পুনর্জাগরণে সচেষ্ট ছিলেন।

মুসলিম জাতি ও এর চিত্তশক্তিকে দুর্বলকারী আরও বহু প্রচলিত ধারণাকে আল্লামা ইকবাল খণ্ডন করে এ শক্তিকে বলবীর্যে ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে দুর্জয় মনের অধিকারী করতে চেয়েছেন। ইসলামের এই মহান সংস্কারক প্রকৃত সূফীবাদ যাকে কোরআনের পরিভাষায় "তাযকিয়া-এ-নাফস" বলা হয় অস্বীকার করেননি। অবশ্য, তাঁর সূফী-দর্শন ফানাফিল্লা তথা আত্মাকে আল্লাহর মাঝে বিলীন করা নয়—আত্মাকে উন্নত করে আল্লাহকে তার মধ্যে স্থাপনেরই শিক্ষা দেয়।

আল্লামা ইকবালের প্রদর্শিত ইসলামী শক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম উম্মাহ তার আবির্ভাবের লক্ষ্যপথে দ্রুত এগিয়ে গেলেই হবে কবির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ইকবালের রাসূল প্রেম

সাইফউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে নবী তুমি (বিশ্ববাসীকে) বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার (নবীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল-ইমরান, ৩১ আয়াত)। উপরোক্ত আয়াতে বুঝা যায় রাসুলের ভালবাসা দ্বারাই আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র পথ। আর আনুগত্য ও অনুসরণ যদি পরিপূর্ণভাবে না হয় তাকে প্রেম বলা যায় না। সেহেতু আল্লাহর সংগে প্রেম করার অর্থ আল্লাহর দেয়া আদেশ-নিষেধসমূহ পুরো মেনে চলা এবং রাসুলের প্রেম হওয়ার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা। হাদীস শরিফে বর্ণিত হয়েছে রাসুল বলেন, তোমাদের কেউ (পুরা) ধর্ম বিশ্বাসী (মুমিন) হবে না যে পর্যন্ত না আমি তাদের পিতা, তাদের সন্তান এবং সমস্ত লোক হতে তার কাছে প্রিয় পাত্র না হবো, (বুখারী, মুসলিম)। উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের নিরীখেই আমরা আল্লামা ইকবালকে নিরূপণ করতে চাই। ইকবাল পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্ট শহরে ১২৯৪ হিঃ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইকবালের পিতা ও মাতা ধর্মভীরু ছিলেন। তাই ইকবাল সুযোগ্য পিতা-মাতার সান্নিধ্যে থেকে ছোট বেলা হতে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেন। তিনি যদিও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তদুপরি তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষায়ও বেশ দক্ষ ছিলেন। আরবী শিক্ষা করার সুযোগ হয়েছিল বাল্যকালেই তাঁর সুযোগ্য ওস্তাদ মৌলভী আবুল হাসান হতে। তাঁর পিতা এমন সময় তাঁকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করিয়ে ছিলেন, যখন ফতোয়া দেয়া হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষা করা মহাপাপ। তিনি মনে করতেন, কালের সংগে তাল মিলাতে না পারলে মুসলিম সমাজ কোন দিন দাঁড়াতে পারবে না। তাই তিনি ইকবালকে অছিয়ত করে গিয়েছিলেন আজীবন ইসলামের জন্য কাজ করতে। ইকবাল তা ভাল করে বুঝাতে পেরেছিলেন। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন, পাশ্চাত্য

শিক্ষার মূল হলো বস্তুবাদ, যা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। আর এই নাস্তিকতার সাথে পরকাল ও আখেরাতের কোনপ্রকার সম্পর্ক হতে পারে না। বিপরীত ধর্মী এই মর্দে মুজাহিদ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও প্রচলিত ধর্মহীন সভ্যতাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, আল্লামা ইকবাল বর্তমান পদ্ধতিতে যদিও মাদ্রাসার সনদধারী কোন আলেম ছিলেন না। তদুপরি আরবী, ফার্সী তথা কোরআন হাদীসের একজন সু-পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাতে কারও দ্বিমত নেই। তিনি লাহোরে টি, ডাব্লিউ, আর্নাল্ড হতে আরবী ভাষা শিক্ষা করে এক চমক লাগিয়ে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি পশ্চিমা চরিত্র বিধ্বংসী ইউরোপীয় সভ্যতাকে মানবজীবনের কল্যাণের অন্তঃসার শূন্য বলে মনে করতেন।

ইকবাল যে সত্যিকার রাসুল প্রেমিক ছিলেন তার প্রমাণ মেলে এই উক্তিতে। ইশ্‌কে মাহবুবে খুদা আয় দিল জিসে হাসিল নহী। লাখো মুমিন হো মগর ঈমানে কামিল নেহী। অর্থাৎ খোদার প্রিয়ের প্রেমটি যার ওহে হৃদয় হয়নি হাসিল হোক না কেন লাখো মুমিন ঈমান তাহার হয়নি কামিল ; শেখ সাদীও বলেছেন ঃ

খিলাফে পয়গাম্বর কসে রাহ গুযীদ
কে হরগিয ব-মনযিল ন খাহদ রসীদ

অর্থাৎ, ছেড়ে তুমি পয়গম্বরে যে পথেতেই যাওনা কেন কিছুতেই সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে না ধ্রুব জান।

ইকবালের দর্শনের মূল ভিত্তিই ছিলো তৌহীদ। আল্লাহর একত্ববাদ ও রিসালাত। এই দুই আদর্শের আলোকেই জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য গোটা জীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি আরও বলেন ঃ

দর দিলে মুসলিম মকামে মোস্তফা আস্ত
আবরা, এ মা যে নামে মুস্তফা আস্ত

অর্থাৎ, মুসলিমের হৃদয়খানী মুস্তফার যে বাসস্থান মুস্তফার নামে তাদের মুখ হয়েছে সমুজ্জ্বল।

রাসুল প্রেমের নজীর তাঁর বাল্য জীবন হতেই পাওয়া যায়। তিনি যখন কোরআন তিলাওয়াত করতে বসতেন তখন অত্যন্ত ভয়ভীতি ও ভক্তি নিয়ে

বসতেন। হাদীস শরিফ অধ্যয়ন করতেও অতি নম্রভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে পড়তেন। কোরআন তেলাওয়াত করতে এমন সময় দেখা যেতো না যখন না মহাকবি ক্রন্দনরত থাকতেন। কবি প্রায় সময়ই বলতেন যে, মুসলিম মিল্লাতের এই ইজ্জত হুরমত এটা একমাত্র রাসূলে পাক (সঃ)-এর বদৌলতেই।

আর হুজুরের নামের ফযিলাতেই আমাদের এ ইজ্জত। কবি এটা দ্বারাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইহকাল ও পরকালের মুক্তির দূত হলেন মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)। রাসূলের প্রতি যে তাঁর ভক্তি ভালবাসা ছিল সম্পূর্ণ অকৃত্রিম তার প্রমাণ হলো—তিনি যদি কোন মাহফিলে রাসূলের নাম শুনতেন বা বলতেন তখনি তাঁর দু' চোখ বেয়ে পানি এসে যেতো। শুধু পানিই নয়, তাঁর আত্মা কেঁপে উঠতো। ডঃ জাভেদ ইকবাল বলেন, শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের মৃত্যুকালে আব্বাজানের চোখে পানি দেখিনি। কিন্তু যখনি আব্বাজান কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন শুরু করতেন বা রাসূলে পাক (সঃ) সম্পর্কে কোন আলোচনা শুনতে পেতেন তখনি আব্বাজানের অন্তর কেঁপে উঠে দু'চোখ বেয়ে অনবরত পানি বেরুতো। হাদীসে দুনিয়ার সবচেয়ে রাসূলকে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। মহাকবির মধ্যে তা-ই বিদ্যমান নয় কি? আর বিংশ শতাব্দীর এক বিরল ঘটনা বৈ আর কি!

এমনিভাবে আরো দেখা যায় যে, হুজুরের নাম কখনো কেউ যদি উচ্চারণ করতো মুহাম্মদ সাহেব বলে তখনই তিনি তার প্রতিবাদ করতেন এক সেকেণ্ড সময় সহ্য করতেন না, এবং এ ধরনের শব্দ শুনলে তিনি দুঃখিত ও মর্মাহত হতেন। কথিত আছে, একবার কয়েকজন যুবক তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখলো কবির মন মেজাজ খারাপ ও চোখ-মুখ লাল। চোখের পানি টল-মল করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন আজ এক মুসলিম যুবক আমার সামনেই মুহাম্মদ (সঃ) কে মুহাম্মদ সাহেব বলে বার বার আওড়াচ্ছিল। এতে আমার আফসোস হয়েছে যে, যে জাতির যুবকরা তাদের প্রিয় রাসুল (সঃ)-এর শানে এ ধরনের অশোভন ও শরিয়াত বিরোধী বাক্য ব্যবহার করতে পারে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ কোন দিন উজ্জ্বল হতে পারে না। তাদের জীবন শুভ ও মঙ্গলময় হতে পারে না।

কবির ভাষায়ঃ কলব মেঁ সোখ নহী রূহ মেঁ ইহসাস নহী
কুছ ভী পয়গামে মোহাম্মদকা তুমহে পাস নেহী।

অর্থাৎ ঃ আত্মাতে নেই অনুভূতি দিলের মাঝে নেই জ্বালা
মুহাম্মদের বার্তা সবই করেছো হায় বিস্মরণ।

একবার আল্লামা কর্তৃক পরিচালিত অনুষ্ঠানে রাসূল পাক (সঃ)-এর শানে আপত্তিমূলক কথা বলায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোচনা বন্ধ ও উক্ত মাহফিল হতে বের করে দেওয়া হয়েছিলো। একবার কিছুলোক কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলো যে, রাসুলকে পাওয়ার উপায় কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তার উপায় হলো রাসুলের পথ পুরোপুরি অনুসরণ করা।

কবি বলেছেন ঃ কুওয়াতে ইশ্ক সে হর পস্তকো বালা করছে
দহর মেঁ ইসমে মুহাম্মদ সে উজ্বালা করছে।

অর্থাৎ ঃ প্রেমের বলে উঁচু করে তোল যত সব নিম্নস্থল
মুহাম্মদের নামের আলোয় তোল করে সব সমুজ্জ্বল।

কবি একবার কোন এক আলোচনা সভায় রাসুল-মহব্বতের একটা উদাহরণ এভাবে তুলে ধরেছিলেন যে "একদিন একব্যক্তি হযরত বায়যীদ বোস্তামী (রঃ)-এর দরবারে একটি তরমুজ নিয়ে হাজির হলো। হযরত বায়যীদ (রঃ) তরমুজটি রেখে দিলেন। তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন এই বলে যে, আমার জানা নেই, রাসূল পাক (সঃ) তরমুজ খেয়েছিলেন কি না। তাই তরমুজ খেয়ে নবী (সঃ)-এর আদর্শের খেলাফ কাজ করতে তাঁর সাহস হচ্ছিলো না। এ ঘটনাটি বলেই কবি কেঁদে ফেললেন। এতে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হয়ে পড়েন। অনুরূপ আরও একটি ঘটনা বলে আল্লামা ইকবাল কেঁদে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হলো, কোন একদিন মওলানা রূমী (রঃ) বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কিছু ছেলেকে খেলা করতে দেখতে পেলেন। ছেলেরা মওলানাকে সালাম দিলে তিনি তার জওয়াব দিয়ে দীর্ঘক্ষণ তথায় দাঁড়িয়ে থাকার পর রওয়ানা দিলেন। তখন দূর হতে একটি ছেলে চীৎকার দিয়ে উঠলো এই বলে মওলানা, আমার সালামের জওয়াব দিয়ে যেতে হবে তার আগে আপনি যেতে পারবেন না। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেটির সালামের জওয়াব দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে রওয়ানা হলেন এবং বললেন, এ স্বভাব রাসূল পাক (সঃ)-এর ছিল তাই আমি একটা সুন্নত আদায় করে ধন্য হলাম।

ভারতের স্বাধীনতা উপলক্ষে লণ্ডনের কোন এক গোলটেবিল বৈঠক হতে দেশে ফেরার পর এক বন্ধু ইকবালকে বললো, লণ্ডন হতে ফিরার পথে মদীনা

হয়ে রাসূল পাক (সঃ)-এর যিয়ারত করে ফিরলে ভাল হতো না? একথা শুনে আশেকে রাসূলের চেহারা লাল হয়ে চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করলো। অনেকক্ষণ কান্না ও নীরব থাকার পর নিজেকে সংবরণ করে বললেন, "কোন্ সাহসে রাসূল (সঃ)-এর যিয়ারতে যাবো ভাই। ঐ দরবারে যাওয়ার মত কোন আমল তো আমার নেই।

একবার হাকিম আহমদ রেজা তাঁর দরবারে সাক্ষাতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ডঃ সাহেব আপনার চেহারা এমন মলিন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, ভাই হাকিম, আমি চিন্তা করছি আমার বয়স রাসূল (সঃ)-এর চেয়ে বেশী হয় কি-না! (সে সময় কবির বয়স ছিল ৬১ বছর।) একবার এক সীরাতুন্নবী (সঃ) মাহফিলে তিনি ঈমানী শক্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা বলেছিলেন তাহলো কুফফার ও মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে এমতাবস্থায় মুসলিম সেনাপতির ঘোড়াটি ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হলো আর চারদিক হতে এভাবে তীর আসতে শুরু করলো যে, ঘোড়ার দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়লো। ঘোড়াটি বার বার বসে পড়তে চেষ্টা করছিল। অপরদিকে কাফেরী শক্তি প্রবল প্রতাপে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। এ চরম মুহূর্তে সেনাপতি ঘোড়াকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ঘোড়া, যুদ্ধের এই বিপজ্জনক অবস্থায় ময়দান ছেড়ে চলে গেলে কিয়ামতের দিনে আমি তোমার বিরুদ্ধে খোদার দরবারে নালিশ করবো। এ ঘটনা বলে তিনি উচ্চৈস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করলে উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

আর একটি ঘটনা, কোন একদিন মহাকবি এক ভক্ত ধনীর বাড়ীতে মেহমান হয়েছিলেন। বাড়ীওয়ালা সুফী আল্লামাকে পেয়ে মহানন্দে সুন্দর খাবার খাইয়ে ভালো বিছানাতে শুইতে দিয়েছিলো। মহাসাধক ইকবাল শুইতে গিয়ে চিন্তা করলেন যে, আমার নবী, যিনি উম্মতের জন্য নয় গোটা সৃষ্টির জন্য রহমত আল্লাহর একমাত্র হাবীব তার আদতের খেলাপ করে নবীর সামনে মুখ দেখাবো কি করে? তিনি তো এমন মখমল সুন্দর বিছানাতে কখনো শুইতেন না। আর আমি এটা করব? না তা হতে পারে না। তাই তিনি গোসলখানায় গিয়ে একটা চৌকির উপর বসে কাঁদছিলেন। বেশ কিছু সময় পরে তিনি পরিচারককে ডেকে একটা মোটা চাটাই আনতে বললেন এবং সেই চাটাইয়ের উপর শুয়েই ইকবাল রাত কাটালেন এই জন্যে যে, রাসূল (সঃ) মোটা চাটাইয়ের উপর শয়ন

করতেন। বাড়ীওয়ালা এই খবর পেয়ে ভীষণভাবে লজ্জিত হলেন এবং কবিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে টল টল চোখে তিনি উত্তর দিলেন, যেই নবীর রহমত ও বরকতে আমরা উত্তম জাতি হয়েছি ও মর্যাদা পেয়েছি সেই রহমতের ও দরদের রাসূল সারাটি জীবন মোটা চাটাইয়ের উপর শুয়েছেন। সেহেতু, আমার জন্য উন্নতমানের বিছানায় শয়ন করা ঠিক হবে না। ওই বাসায় তিনি যে ক'দিন ছিলেন সেই চাটাইয়ের উপর শুয়েই কাটিয়েছেন।

ইকবাল রাসুলের শানে বলেন ঃ

হো না ইয়ে ফুল তো বুল কা তারান্নুম ভী না হো
চেমন দাহর মে কলিও কা তাবাসসুম ভী না হো

অর্থাৎ ঃ ফুল (মুহম্মদ (সঃ) না হলে বুলবুল গান গাইতো না,
বাগিচায় ফুল ফুটতো না।

তিনি আরো বলেন ঃ

মাকামে খেশ আগার খাহী দরী দিযর
বাহক দিল বন্দ ও রাহে মোস্তাফার ও

অর্থাৎ ঃ এই জগতে চাও যদি গো করতে আপন স্থান তোমার।
বাঁধ হৃদয় খোদার সাথে, চল পথে মুস্তফার।

মোদ্দাকথা হলো, এ জগতে মর্যাদা লাভ করতে হলে অন্তর খোদামুখী এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর পথ ধরতে হবে এটা শাশ্বত সত্য।

বাংলা ভাষায় আল্লামা ইকবালের 'শিকওয়া-জওয়াব-ই-শিকওয়া'

মুহম্মদ আবু তালিব

একজন পারস্য দেশীয় প্রেমিক তাঁর তুর্কী প্রেমিকার কাছে আফসোস করে নাকি বলেছিলো—

"যবানে ইয়ারে মান্ তুর্কী
ওয়ামান তুর্কী নামি দানাম,
কে খোশ বুদে আগার বুদে
যবানাশ দারূদে হানে মান ॥"
মানে, আমার বধূর ভাষা তুর্কী
আর আমি তুর্কী জানিনে,
কত ভালোই না হত
যদি বধূর ভাষা আমার মুখে হত।"

আজ আল্লামা ইকবালের 'শিকওয়াহ' ও তাঁর 'জওয়াব-ই-শিকওয়াহ' কাব্যের অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে কথাটা আমার বার বার মনে পড়ছে। কত সুন্দরই না হত যদি আল্লামার কবিভাষা আমারও মুখের ভাষা হত।

তা যখন হয়নি, তখন আর উপায় কি? আজ দুধের স্বাদ আমাকে ঘোল দিয়ে মিটাতে হাচ্ছে।

আল্লামা ইকবাল তাঁর 'শিকওয়া' কাব্য শুরু করেছেন এ-ভাবে—

"কেঁউ যিয়াকার বানুঁ সূদে ফারামুশ রহুঁ, ফিকরে ফারদা না করোঁ
মাহভে গমে দোশ রহুঁ—
নালে বুলবুলে কে শোনুঁ
আওর হমহাতান গোশ রহুঁ।
হম নভা মাঁয় ভী কো-ই গুল হুঁ
কে খামুশ রহুঁ?"

বিভাষী অনুবাদকরা এর অনুবাদ করেছেন বিভিন্নভাবে। দু-একটি নমুনা পেশ করা যাচ্ছে। প্রথমেই আশরাফ আলী খানের অনুবাদ পেশ করা গেল—

"সর্বহারা চিত্ত আমার
এই কথাটি বলতে চাহে,
লোকসানেরই সওদা করি
চলছি খোদা তোমার রাহে।
বর্তমানের ক্ষেত্রে আমার
শস্যবিহীন শুধুই ফাঁকি,
দূর অতীতের শবদেহকে
সামনে রেখেই তুষ্ট থাকি।
গোলাপ কড়ি নই আমি যে
রইব পড়ি কাঁটার ঝাড়ে,
চলবে না ক' পাষাণ হিয়া
বুলবুলিদের হাহাকারে।"

সম্ভবতঃ আশরাফ আলী খানই 'শিকওয়া' (শেকোয়া) কাব্যের প্রথম বাংলা অনুবাদক। দ্বিতীয় অনুবাদক ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ, ১৯৪২)। তৃতীয় অনুবাদ মোহাম্মদ সুলতানের। এর সর্বশেষ অনুবাদক সম্ভবতঃ কবি গোলাম মোস্তফা। আরও কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তা উল্লেখ্য নয়। অবশ্য, আল্লামা ইকবালের অনুমতি-প্রাপ্ত অনুবাদক কবি মোহাম্মদ সুলতানের অনুবাদ আগেই প্রস্তুত হয়েছিল, প্রকাশের বিলম্ব ঘটেছে (১৯৪৬)। এর ভূমিকায় কবি নজরুল ইসলাম তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ অভিমতটি দিয়েছিলেন, এখানে তার উদ্ধৃতি না দিয়ে পারা গেলো না। তিনি লিখেছেন— "সুলতানের 'শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া পড়লাম, আসল শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া পাশে রেখে। অনুবাদের দিক দিয়ে এমন সমর্থক অনুবাদ আর দেখেছি বলে মনে হয় না। কবি সুলতানের অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হলাম, অরজিন্যাল ভাবকে এতটুকু অতিক্রম না করে এর অপরিমাণ সাবলীল সহজ গতিভঙ্গী দেখে। পশ্চিমের বোরখাপরা মেয়েকে বাংলার শাড়ীর অবগুণ্ঠনে যেন আরও বেশী মানিয়েছে (১৫ ভাদ্র, ১৩৩৩/১৯৩৬)।" কথাটি যে

ভক্তের অতিশয়োক্তির জন্য তার নমুনা পেশ করা গেলো। বলাবাহুল্য, এটিও পূর্বোক্ত প্রারম্ভিক শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ।

যথা—

"কেন বল ত্যাজি লাভের আশা
ক্ষতিই সহিব নির্বিকার,
ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া
অতীত চিন্তা করিব সার।
বিভোর হিয়ায় শুনে যাবো
আর গাবে বুল বুল ব্যথা বেভুল,
রব নির্বাক জড়ের মতন
আমি কিগো মূক ফুল্লমুকুল!"

এবার কবি গোলাম মোস্তফার অনুবাদ—

"ক্ষতিই কেন সইব বল?
লাভের আশা রাখবো না?
অতীত নিয়ে রইব বসে
ভবিষ্যত কি ভাব না?
চুপটি করে বোবার মতন
শুনব কি গান বুলবুলির
ফুল কি আমি? ফুলের মতই
রইব নীরব নম্র শির?"

তিনটি অনুবাদই তিনজন কবির। তিনটিই সুন্দর। এর কোনটিরই বা নিন্দা করা যায়? তবু বলব, আল্লামা ইকবালের মূল কবিতার ভাব অনুবাদে পূর্ণরূপ পায়নি। কিন্তু উপায় কী।

'শিকওয়া' অর্থ নালিশ, অভিযোগ। ভক্ত তাঁর প্রিয়তমের নিকট তাঁর প্রাণের আর্তি জানাচ্ছেন এই বলে—তোমাকে ভালোবেসে এই কি ফল, শুধু ক্ষতিই সয়ে গেলাম সারা জীবন! আমার বেদনার গান একটি বনের বুলবুলিই গেয়ে গেল, আমি শুধু নির্বাক জড়ের মতই সে গান শুনেই গেলাম।

বলব কি? আর বলবই বা কার কাছে? যার কাছে বলব, সেই পরম দয়িতই তো আমার অভিযুক্ত—আসামী। স্রষ্টার কাছে এ সৃষ্টির নালিশ।

স্রষ্টা সৃষ্টি করেই যেন বিপদে পড়েছেন। তাই সৃষ্টির নালিশের জবাব তাঁকেই দিতে হচ্ছে।

যিনি হাকিম, দোষীও তিনি।

বাঙালী অনুবাদকের ভাষায়—

"হাকিম তুমি দোষীও তুমি
বিচার হবে শাহান শাহর"।

নালিশ কী?

"আজকে নালিশ তোমার নামে
এই কি তোমার খোদায়ী কাম,
পাপীরা সব জান্নাতি আর
পুন্যবানের জাহান্নাম?

এ নালিশ উপ-মহাদেশের মুসলিম সমাজের, আসামী স্বয়ং দ্বীন-দুনিয়ার মালিক বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়া'লা।

তার অপরাধ?

অপরাধ এই যে, পবিত্র আল্‌-কুরআনে ঈমানদার মুসলমানদের যাবতীয় সৎকর্মের জন্য উপযুক্ত অনুদানের ওয়াদা করেছেন তিনি; বলেছেন, প্রত্যেক সৎকর্মের জন্য তাদের পুরস্কার দেবেন। যার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পারলৌকিক 'বেহেস্ত'। তার মানে কি এই যে, দুনিয়ায় তারা বিধর্মীয় নির্যাতন ভোগ করেই যাবে। কোথায় সেই খোদা তায়া'লার ওয়াদা? খোদা না বলেছেন, মুসলমানের জন্য তিনি দুনিয়ার শাহানশাহী রেখেছেন? আখেরী নবী রসুলুল্লাহ (সঃ) ও তো বলেছেন, মুসলমানদের জন্যই আল্লাহ দ্বীন ও দুনিয়ায় সুখ শান্তি মওজুদ রেখেছেন! আর আজ কি দেখা যাচ্ছে?

বোতখানার মূর্তিরাও মুসলমানদের দুর্দশা দেখে আজ হাসছে। বলছে—

"বুত সনম খানোঁ মেঁ কহতে হাঁয়
মুসলমাঁ গয়ে,
হায় খুশী উনকো কে কাবে কে
নিগাহবাঁ গয়ে।
মনযিলে দহ্‌র সে উটোঁ কে
হুদী খাঁ গয়ে,
আপনি বগলো মেঁ দবায়ে হুয়ে
কুরআঁ গয়ে।"

তরজমা—

"মন্দিরেতে মূর্তিরা কয়
গেলই ভালো মুসলমান,
বড়ই খুশী মনে তাদের
গেলই কা'বার দারোয়ান।
দুনিয়া হতে গেল চলে
গাইত যারা উটের গান,
চলে গেল বগল তলে
দাবিয়ে রেখে কোরান খান।"

—শহীদুল্লাহ

তাই বড় দুঃখে ভক্ত বুক-ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন—

"আয় খোদা শিকওয়া-এ আরবাবে
ওফা ভী সুনলে
খুগরে হামদ সে থোড়া সা
গিলা ভী সুন লে।"

অনুবাদ—

"নালিশ আজি করছে খোদা
তোমার ভক্ত বান্দা শোন,
স্তব-স্তুতি স্বভাব যাদের
একটু তাদের নিন্দা শোন।"

—শহীদুল্লাহ

অভিমানী ভক্ত এবার তাঁর পূর্বপুরুষের বীরত্বপূর্ণ গাথা শোনাতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, একদিন কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা পায়ে দলে সারা দুনিয়ায় তাঁরা তাঁর তৌহীদ বাণীর প্রচার করে ফিরেছে। সেদিন যদি মুসলমানরা এ প্রচার না করত আজ তাঁকে কে চিনত (এই অদেখা খোদাকে)? তারপর তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

"থে হমেঁ এক তেরে মা'রকা
আরাওঁ মেঁ,
খুশকীওঁ মেঁ কভী পড়তে
কভী দরিয়াওঁ মেঁ,

দীঁ আযানেঁ কভী ইয়ুরোপকে
কলীসাওঁ মেঁ।
কভী আফরিকাকে তপতে হুয়ে
সহারাওঁ মেঁ।
শান আখোঁ মেঁ নাদচতী থী
জাহাঁ দারোঁ কী,
কলমা পড়তে থে হম
ছাওঁ কে তলওয়ারো মে।"

অনুবাদ—

"ছিলাম মোরা অদ্বিতীয়
যোদ্ধাদলের গণনায়,
লড়তাম মোরা কভু ভূমে,
আরও কভু দরিয়ায়।
'আযান' মোরা ধ্বনিয়াছি
ইউরোপেরও গির্জিায়,
কখনও বা আফ্রিকারই
রৌদ্রতপ্ত সাহারায়।
তুচ্ছ ছিল চক্ষে মোদের
বাদশাহী এ দুনিয়ার,
কলমা বাণী ভুলি নাকো
পড়লে শিরে তলোয়ার।
— শহীদুল্লাহ

আজ এই কি তার পরিণাম—দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের এই দুর্দশা? পক্ষান্তরে 'কাফির'দের সুখের আর অন্ত নেই। কবি দুঃখ করে বলেছেন—

"কহর তো ইয়ে হাঁয় কে
কাফির কো মিলে হুর ও কসূর
আওর বেচারে মুসলমাঁ কো
ফাকাত ওয়াদায়ে হুর"।

অনুবাদ—

"কাফের তরেই গড়লে তুমি
এই জগতেই স্বর্গপুর,
শোনাও মোদের ভুয়া কথা
মরণ পরে আসবে হুর।"

—আশরাফ আলী

তুলনীয় মোহাম্মদ সুলতানের—
"আফসোস হায় হুরীসহ তারা
করিছে রম্য হর্মে বাস,
মুসলিম তরে রাখিয়াছ খালি
কেবল হুরীর প্রাপ্তি আশ।"

অথচ মুসলমানরা তাঁর ও তাঁর রসুলের জন্য কি-না করেছে ?

এই দুনিয়ায় কত জাতিরই না বাস আছে, কিন্তু কেউ কি আল্লাহ-রসুলের নামে এমন নিবেদিত চিত্তে আত্মদান করেছে? তাই তাঁর প্রশ্ন—

"বাস রহে থে ইহাঁ সলজুক ভী তুরানী ভী
আহলে চীন চীন মে ইরান মে সাসানী ভী,
এসি মা'মুরে মেঁ আবাদ নে ইউনানী ভী,
এসি দুনিয়া মেঁ ইয়াহুদী ভী নাসরানী ভী।
পর তেরে নাম পে তলওয়ার উঠায়ী কিসনে
বাত জো বিগড়ে হুয়ী থী উহ বানায়ী কিসনে ?

অনুবাদ—

"বসত করিত সলজুক হেথা
ছিল তুরস্কে তুরানীও,
সৈনিক ছিল চীন দেশ জুড়ে
ইরান দেশেতে সাসানীও,
ধরণীর এই বুক হতে কভু
ইউনানীরাও পড়েনি বাদ,
খ্রীষ্টভক্ত আরও ইহুদ
কতনা জাতির ছিল আবাদ।

কেহ কি তোমার মহিমার লাগি
করেছিল তেগ উত্তোলন ?
বিকল তোমার সৃষ্টিযন্ত্রে
বাঁধিল নিয়মে কোন সে জন ?"

—সুলতান

তুলনীয় গোলাম মোস্তফার—

"সেলজুক আর তুরানীরা
বাস করিত হেথায় বেশ,
চীন দেশেতে ছিল চীনা
সাসানীরা ইরান দেশ।
এই ধরাতেই ছিল প্রাচীন
সভ্যজাতি ইউনানী
ইহুদী আর নাসারারা
জানি মোরা তাও জানি।
কিন্তু বল তোমার তরে
তেগ তলোয়ার ধরল কে ?
বিগড়ে যাওয়া তোমার বিধান
কায়েম আবার করল কে ?"

এ-জাতি মুসলমান ছাড়া আর কে ? কবির প্রশ্ন।

এবার তাঁর 'জওয়াব-ই-শিকওয়া' থেকে একটু জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

বলা বাহুল্য, খোদার নামে এ-ভাবে নালিশ জানানোর কারণে ইকবালকে 'কাফির' খিতাবে ভূষিত করা হয়।

এবার ইকবাল তার জওয়াব দিচ্ছেন। জওয়াব দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্‌রই জবানীতে।

"কেয়া কহা ? বাহরে মুসলমাঁ হায়
ফাকাত ওয়াদায়ে হুর,
শিকওয়া বেজা ভী করে কোই তো
লাজেম হায় শউর।

আজল হায় কাতেরে হাস্তি কা
আজল সে দস্তুর
মুসলিম আয়ে হুয়া তো কাফির মিলে
হুর ও কসুর।"

তরজমা—

"কি বলিলে আমি দিই মুসলিমে
কেবল হুরীর প্রাপ্তি আশা,
হলেও সত্য অভিযোগ হায়
বলিবার তবু আছে তো ভাষা।
চির সুবিচার স্রষ্টার রীতি
হয়নি খেলাপ দস্তুরের
লাভিল কাফের হর্ম ও হুরী
মানিয়াই নীতি ইসলামের।"
—সুলতান

তুলনীয়—

"বল্লে ভালো মুসলিম তরে
কেবল হুরের ওয়াদা খানি।
নিন্দা মিছে করলে নাকি
বলবে সবে জ্ঞানী-গুণী
সৃষ্টিকর্তা ন্যায় বিচারী,
এই বিধান দস্তুর জানি,
বিধর্মী পায় হুর ও দৌলত
নিলে আইন মুসলমানী।"
—শহীদুল্লাহ

অর্থাৎ, আল্লাহ বলেছেন—তিনি ন্যায় বিচারই করে থাকেন, অন্যায়াচার তাঁর দস্তুর নয়। তবে, মুসলমানী কারও জন্মগত অধিকার নয়। মুসলমানী অর্জন করতে হয়। মুসলমানী নীতি যাঁরা গ্রহণ করবেন, আল্লাহ্‌র বিচারে তাঁরাই মুসলমান। বর্তমানকালের মুসলমান নামধারীরা কি যথার্থ ইসলামের পথে আছে ?

কবি বলেন—

"ওয়াজায়া যে তুম হো নাসারা,
তমদ্দুন মে হনুদ,
ইয়ে মুসলমাঁ ? যিন কি দেখকে
শর্মায়ে ইয়াহুদ ?
য়িউঁ তো সৈয়্যিদ ভী হো মির্যা ভী হো
আফ্‌গাঁ ভী হো,
তুম ভী সভী কুছ হো বাতাও তো
মুসলমাঁ ভী হো।"

অনুবাদ—

"খ্রীষ্টান তুমি বেশ-ভূষাতে
সভ্যতাতে তুমি হনুদ,
মুসলমান এই! যারে দেখে
লজ্জায় মরে আজি ইহুদ।
সৈয়দ কিংবা মির্যা কিংবা
হতে পার আফগানও,
সব তুমি হতে পার? ঠিক তুমি
মুসলমানও?"

—শহীদুল্লাহ

তুং সুলতানের—

"রীতিনীতি তব খৃস্টানসম
হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়,
এই কিহে সেই মুসলিম
যারে ইহুদীও দেখে লজ্জা পায়।
মুখে বল তুমি মির্জা সৈয়দ
মহা পণ্ডিত বীর পাঠান,
সব কিছু তব হওয়া সম্ভব
নও শুধু তুমি মুসলমান।"

উল্লেখ, 'শিকওয়ায়' কবি মুসলমান পূর্ব-পুরুষদের ইসলামের সেবার দোহাই দিয়ে নিজেদেরকে তাদের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেছিলেন। জওয়াবে আল্লাহ বলেন,—তোমরা কি সেই পিতৃ-পিতামহের বংশধর, যাঁদের—

"জো ভরোসা থা উসে কুওতে
বাজু পর থা,
হায় তুমহেঁ মওত কা ডর,
উসকো খোদা কা ডর থা।
বাপ কা ইলম না বেটে কো
আগার আজবর হো,
ফির পিসর কাবিলে মীরাসে
পিদ্‌র কিউঁ কর হো।"

অনুবাদ—

"ভরসা তার শুধুই ছিল
নিজের দু'টি বাহুর উপর,
মরণ ভয়ে তুমি ভীরু,
খোদা বই তার ছিল না ডর।
পিতার বিদ্যা পুত্রের নাইকো,
নামটা মাত্র হল সার,
কেমন করে পিতৃ ধনে
হবে পুত্রের অধিকার।"

—শহীদুল্লাহ

উপসংহারে আল্লা'হ বলেন—যদি প্রকৃত মুসলমান হও, তবে—

"আকল হায় তেরী সপর
ইশক হায় শমশীর তেরী,
মেরে দরবেশ। খিলাফত হায়
জাহাঁগীর তেরী।
মা সেওয়া আল্লাহ কে লি-এ
আগ হায় তকবীর তেরী,
তু মুসলমাঁ হো তো
তকবীর হায় তদবীর তেরী।
কী মুহম্মদ সে ওফা তুনে
তো হাম তেরী হাঁয়,
য়িহ্ জহাঁ চীয্‌হী কেয়া
লও হো কলম তেরী হাঁয়।"

অনুবাদ—

"বুদ্ধি হবে তোমার বর্ম, আর প্রেম হবে
তলোয়ার। হে আমার দরবেশ!
নিখিল বিশ্বের তুমিই তো শাহানশাহ।
আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছুকে জ্বালিয়ে
দিতে 'তকবীর'কে আগুন হিসেবে মনে
কর;
হাঁ, যদি মুসলমান হও, তদবীরই হবে
তোমার তকদীর / ভাগ্য।
মুহম্মদের প্রকৃত ভক্ত হও, দেখবে
আমিও তোমার হব। বিশ্ব জগৎ তো ছার;
(আমার) 'লওহ কলম'-ও তোমার হবে।"

তাই 'শিকওয়া' নালিশ নয়—এযে আল্লামার গভীর আত্মোপলব্ধির বাণী। এ বাণীর অনুবাদ হয় না, হয় ভাষানুবাদ, নয় ভাবানুবাদ। বাংলা ভাষাতেও তা-ই হয়েছে।

মর্মকথাটি কবি তাঁর জওয়াবের উপসংহারে বলেছেন। কথাটি সংক্ষেপে এই—পার্থিব জয়-পরাজয় কিছু নয়—আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশিত পথই মুসলমানের পথ। যে সে পথের সন্ধান পেলো তার আর কোনো ভয় নেই। মুসলমানরা একদিন জগৎ জয় করেছিল, তাতে কি হয়েছে? আল্লামা বলেছেন—

"পথের মানুষ উঠল রথে
আমরা আজি পথচারী
দূর হতে তাই পূর্ব স্মৃতি
দিচ্ছে মোদের টিটকারী।
ক্ষীণকে যারা করল বলী
উৎপীড়কের তুলল দাদ,
জখমী হিয়া তাদের আজি
করছে ব্যথায় আর্তনাদ।"

এটি ইতিহাসের নিয়ম, এটা হবেই। যদি বাঁচতে চাও, সকল ব্যথা-বেদনা ভুলে আবার সেই ফারানের পানে তাকাও। আবার নাও সত্য ও ন্যায়ের পাঠ, নাও বীরত্বের পাঠ, দেখবে দুনিয়ার নেতৃত্ব তোমারই পদতলে লুটছে।

"সবক ফির পড় আদালাত কা সাদাকাত কা শুজাআতকা,
লিয়া জায়েগা তুজ্‌ছে
দুনিয়াকা ইমামত কা।"

আল্লামার উপদেশ, নিরাশ হয়ো না। শোক করো না, প্রকৃত মর্দে মু'মিন হও। দেখবে দুনিয়ার ইমামত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুলনীয় আল কুরআনের বাণী—

"ওআলা তাহেনু ওআলা তাহজানু ওআ আনতুমুল আ'লাওনা, ইন কুনতুম মু'মিনীন।"

মানে, নিরাশ হ'য়োনা, শোক করোনা, (নিশ্চয়ই) তোমরাই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন (বিশ্বাসী) হও।

উপসংহার ঃ

এই আলোচনায় তিনজন বিদগ্ধ অনুবাদকের অনুবাদের নমুনা দিয়েছি। সেগুলোর সবই সার্থক হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না—তবে, সকলের অনুবাদই মোটামুটি মূলের কাছাকাছি গেছে।

অনুবাদককে মূলানুসারী হতে হবে নিঃসন্দেহে, তবে যে ভাষায় সেটি অনূদিত হবে সে ভাষা ও তার ছন্দের দাবীও তাকে মিটাতে হবে। আর কাব্যানুবাদ হলে তো কথাই নেই, তাকে কাব্যের দাবীও মিটাতে হবে। কৌতূহলজনক বলে এখানে এক তরুণ অনুবাদকের অনুবাদের নমুনা দেয়া গেল। তার মতে, পূর্বোক্ত অনুবাদের কোনোটাই সার্থক অনুবাদ নয়। তাই তিনি বাংলা ভাষায় 'শিকওয়া ও জবাবের' সার্থক অনুবাদের প্রয়াস পেয়েছেন।

যথা—

"তোমার কাবা হইত তাবা
আমরা যদি লাঠির ঘার,

বুত ভেঙ্গে না ঝুলিয়ে দিতাম
তোমার কোরান তার ছায়ায়।
তবু মোদের দিচ্ছ গালি
নিমক হারাম মীর জাফর,
তাই যদি তুমিও তবে
বীর শিরাজের নও দোসর।"

বলা বাহুল্য, এখানে তরজমাকার—"পাঞ্জাবী সালওয়ার-ওড়না ওয়ালী পাঞ্জাবিনীকে 'শাড়ী-কাঁচুলি পরিয়ে দিয়ে নিখুঁত বাঙালিনী," এমনকি 'তেজস্বিনী পাঞ্জাবিনীর চোখ রাঙানী, হাত-পা আছড়ানী, কাকুতি-মিনতি' পর্যন্ত উপেক্ষা করে কঠোর হস্তে নির্ভুল বাঙালিনীর চেলী শাড়ী' পরিয়ে দিতে গিয়ে তাকে বাঙলার কারবালা 'পলাশী' ময়দান পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এমনকি প্রিয়তম স্রষ্টাকেও 'বীর শিরাজের দোসর' রূপে দেখতে চেয়েছেন।

[জানিনে, এমন বাংলা অনুবাদ হবে জানলে স্বয়ং আল্লামা এ-কাব্য লিখতে অগ্রসর হতেন কি-না !]

অনুবাদকের স্বাধীনতা আছে বলে এতদূর অগ্রসর হওয়া যায় কি-না, কাব্য-রসিকদের হাতেই সে বিচার ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

এবার মূল কাব্য থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ এবং তার অন্য অনুবাদ দিয়ে বর্তমান আলোচনা শেষ করা যাক।

এবার বান্দার জবাব—

"তেরে কাবে কো জবীন্ সে
বাঁচায়া হামনে,
তেরে কুরআঁ কো সিনেছে
লাগায়া হামনে।
ফির ভী হামসে ইয়ে গিলা হায়
কে ওফাদার নেহি,
হাম ওফাদার নেহি তো
তু ভী দিলদার নেহি।"

অনুবাদ—

"নোয়াইয়া মোর উন্নত শির
জিন্দা রেখেছি থানে কাবার,
পবিত্র কালাম কোরান
বক্ষে চাপিয়া ধরেছি তায়।
হায় পরিহাস তবু অভিযোগ
তোমাতে নহিত ভক্তিমান?
বিশ্বাসহীন হই যদি আমি
তুমিও নও হৃদয়বান।"

—সুলতান

স্রষ্টা ও সৃষ্টির এমন সংবেদ্য আত্ম-প্রকাশের মহাবাণী রূপায়িত করেও আল্লামা ইকবাল বাহ্য শরীয়তপন্থী আলিম-সমাজের হৃদয়হীন সমালোচনা ও কুফুরী ফতওয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

সুখের বিষয়, আজ সেই 'শিকওয়া'র বাণী বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হয়েছে।

আমরা আল্লামার বিদেহী রূহের মাগফেরাত কামনা করি। —আমীন

* এই প্রবন্ধ রচনায় ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 'ইকবাল' (পরিবর্ধিত সং, ১৯৮৫) গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে। —লেখক

আমরা ইকবালের উত্তরসূরি

মুঃ মুহিববুল্লাহ

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন ভৌগলিক সীমারেখার অন্য একটি ভৌগলিক সীমারেখার সাথে মতদ্বৈততা, মতানৈক্য থাকতে পারে, কোন জাতি অন্য একটি জাতির সাথে দ্বি-মত পোষণ করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, কোন সম্প্রদায় অন্য একটি সম্প্রদায়-এর সাথে, কোন একটি দল অপর একটি দলের সাথে, কোন একটি বংশ অপর বংশের সাথে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে পারে—হয়েও আসছে রীতিমত। কিন্তু যে ব্যক্তি সংকীর্ণতাকে আজীবন ঘৃণা করে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে নিরপেক্ষ মত পোষণ করে গেছেন তাঁর বিরুদ্ধে কোন সংকীর্ণমনোভাবী মহলের হীন-মনোভাব পোষণে ঐ ব্যক্তির কিছু আসে যায় না। যেমন বিশাল সূর্যের আলোর সামনে বাধা প্রদানের জন্য কোন মাছি, পোকা যদি পাখা মেলে দেয় তাতে সূর্যের আলোকে দমাতে বা বাধা প্রদান করতে পারে না, তার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে না, তেমনি আল্লামা ইকবালের দর্শন, তাঁর কাব্য, তাঁর সাহিত্যকর্ম, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা, তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর প্রশস্ত মনোভাব পৃথিবীর আস্তিক, নাস্তিক, প্রাচ্যের দার্শনিক পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী সকলের কাছে সমাদৃত। ইকবালের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হোক না কেন তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। বরং ইকবালের ওপর গবেষণা, মূল্যায়ন, থিসিস ইত্যাকার একজন আধ্যাত্মবাদী মানবের যথোচিত মূল্যায়ন করে দিশেহারা মানবসম্প্রদায় প্রশান্তির জন্যে তাঁর মূল্যায়নকেই তীব্র গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, বৃটিশ আমাদের দেশ দু'শ বছর শাসন করে গেলো। নির্যাতনের তাণ্ডবলীলা এদেশের গণ-মানুষের উপর চালিয়ে গেলো। তারপরও সেই বেনিয়া বাহিনীর নামে আমাদের দেশের বিভিন্নস্থানে সাইন বোর্ড দেখা যায়—শাদা-কালো অক্ষরের ছাপ দেখা যায়। এতে আমাদের কারো কিছু আসে যায় না, অথচ বিশ্ববিখ্যাত একজন দার্শনিক, মুসলিম

জাগরণের মানসপুত্র, আধ্যাত্মবাদের অকৃত্রিম দিশারী ইকবালের নাম নির্দ্বিধায় মুছে ফেলা হয়েছে।

যাঁর মধ্যে সংকীর্ণতার লেশ মাত্র নেই তাঁর নাম মুছে ফেলাই বা হলো কোন কালো হাতের ইঙ্গিতে! আমাদের বুঝে আসছে না—কেনই বা তাঁকে মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হয়েছে, অথচ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তাঁর চর্চা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহারের জোর প্রচেষ্টা চলছে, তাঁর স্মৃতিফলক উন্মোচন করা হচ্ছে অলিতে-গলিতে, আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন হচ্ছে সার্কে এসে তাঁরই সঙ্গীত দিয়ে তথাকথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হচ্ছে—সর্বোপরি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সভ্যসমাজ তাঁর রচনার গবেষণায় আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠন করেছে। অথচ আমাদের ভুল আজো ভাঙছে না। যাঁরা ইকবাল চর্চা করতেন তাঁরা আজ কেমোন যেনো খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের মসী যেনো আজ ইকবালের ব্যাপারে শুকিয়ে। বুদ্ধিজীবীদের এই নীরবতায় আমরা সত্যিকারভাবেই কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। তবু আমরা আশাবাদী।

আমরা বিশ্বাস করি মুসলিম অধ্যুষিত এই ভূমিতে মুসলিম জাগরণের এই মানসপুত্রের চর্চা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে—এর গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। ইকবালের উত্তরসুরি হিসেবে আমরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

ইকবালের রচনাবলী

ঈশরাত জাহান

মহাকবি আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবালের সৃজনশীল রচনাবলী মূলতঃ স্থান-কাল ভেদে উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজী এই তিনটি ভাষায় রচিত হয়েছে। এই তিনটি ভাষায় ইকবালের প্রণীত পুস্তকগুলোর ফিরিস্তি হচ্ছে ঃ

উর্দু ভাষায় ঃ (১) ইলমুল ইকতিসাদ্ (২) বাংগেদারা, (৩) বালে জিব্রীল ও (৪) জারবে কালীম। এছাড়া "আরমুগানে হিজাজ" গ্রন্থেও কয়েকটি উর্দু কবিতা স্থান লাভ করেছে, (৫) শিকওয়াহ ও (৬) জও-য়াব-ই-শিকওয়াহ।

ফার্সী ভাষায় ঃ (১) আসরারে খুদী, (২) রমুজে বেখুদী, (৩) পয়ামে মাশরিক, (৪) গুলশানে রাজ-ই-জাদীদ, (৫) জবুরে আজম, (৬) বন্দেগী নামা, (৭) জাভিদ নামা, (৮) মসনবী মুসাফির (৯) পাস চেহ বাইয়াদ করদ আয় আকওয়ামে শারক ও (১০) আরমুগামে হিজাজ।

ইংরেজী ভাষায় ঃ (১) দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিকস ইন ফাসিয়া (২) দি রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস অব ইন ইসলাম (৩) এ সোসিও-লজিক্যাল সার্ভে অব দি মুসলিম নেশন ও (৪) দি ইসলামিক ক্যাপিট্যাল।

ইলমুল ইকতিসাদ ঃ এটা ছিলো উর্দু ভাষায় প্রণীত অর্থনীতির উপর প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ, এতে তিনি অর্থনীতির উপর বিশদ আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংগেদারা ঃ ইকবালের কবি জীবনের প্রথম তিনটি পর্যায়ে রচিত নির্বাচিত উর্দু কবিতার সংকলন ছিলো এটা। ইকবাল তাঁর প্রথমদিকের রচিত কিছু কবিতা এতে সন্নিবেশিত করেননি, যদিও অন্যান্য সাহিত্য সাময়িকিতে এগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো এবং বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে এগুলো পাঠিত হয়েছিল।

বাল-ই-জিব্রীল ঃ ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশ পায়, এর প্রথমার্ধে গজল এবং শেষার্ধে রয়েছে চতুষ্পদী কবিতা, এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইকবাল উর্দু কাব্যোদ্যানে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছেন এই জন্য যে, এই গ্রন্থে তিনি গজলের অনুপম মাধ্যমের মধ্যদিয়ে সেসব বাস্তবতা, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও শিক্ষা তুলে ধরেছেন যা জাতির মধ্যে আন্তরিকতা ও সুদৃঢ় আস্থার ভিত্তি নির্মাণে সাহায্য করে, উপরন্তু পাশ্চাত্যের মোহমায়ার হাতছানি থেকে মুক্ত করে মুসলিম মিল্লাতের সদস্যদের খাঁটি মু'মিনে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

জরবে কালীম ঃ ১৯৩৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কবি এটাকে যুগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা বলে আখ্যায়িত করেছেন, এ গ্রন্থে একটি প্রস্তাবনাপর্ব দেখা যায়। এছাড়া বাকী অংশ বিভিন্ন গজল ও কবিতাসহ মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত, যেমন—(১) ইসলাম ও মুসলিম, (২) শিক্ষা ও সন্তান পালন, (৩) নারী সমাজ, (৪) সাহিত্য ও সুকুমার শিল্প, (৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনীতি ও (৬) মেহরাব গুল আফগানের চিন্তাধারা।

প্রতিটি বিষয়ে ইকবালের অনবদ্য অভিমত, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শেষ কথার মত এবং তার ভাবধারার মধ্যে যে বাণী ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে তা সমগ্র জাতি এবং দেশের মুক্তির কারণ হতে পারে।

আসরারে খূদী ঃ ১৯১৫ সালে ফার্সী ভাষায় ইকবালের সর্বপ্রথম এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এতে ইকবাল বিভিন্ন উপায়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ খূদীর নির্দেশ মেনে চলে, প্রেমে উজ্জীবিত খূদী এ জগতের মধ্যে এবং এর বাইরে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইকবাল খূদী ধ্বংসের নিন্দা করেন, খূদীর অভিব্যক্তি ও চেতনাকে তিনি বরং জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেন, কোন্ পথে খূদীর অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে সেটা দেখিয়ে ইকবাল খূদীর নিখুঁত স্তরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত, কোন কোন পর্যায়ে অতিক্রম করে তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়াসও পেয়েছেন। খূদী অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি হতে সমর্থ করে তোলে,। এই গ্রন্থ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

রমূজে বেখূদী ঃ প্রকৃত প্রস্তাবে এটি "আসরারে খূদী"-এর দ্বিতীয় অংশ। ১৯১৮ সালে স্বতন্ত্রভাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে, পরবর্তীতে অবশ্য

গ্রন্থ দু'টি এক তনুামে প্রকাশিত হয়. এতে ইকবাল তাঁর বক্তব্য দৃঢ় করার নিমিত্ত বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে প্রমাণ করেন যে. একটি জাতির জীবনী শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে ইসলামী জীবন-পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান. যে কোন ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য একটা পর্যায় পর্যন্ত তার ব্যক্তি-গত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা। তবে, একবার এ কাজ সমাধা হওয়ার পর জাতির কল্যাণের খাতিরে ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দেয়া উচিত। গ্রন্থখানি যদিও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে নিবেদিত তবুও ইকবাল গোটা মানব-জাতির উদ্দেশ্যেই কথা বলেছেন বলে মনে হয়। এসব মসনবীতেই ইকবাল ব্যক্তি ও জাতি সম্পর্কে আধুনিক যুগের বিভিন্ন ভ্রান্ত তত্ত্বের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির নিরাপত্তা, অস্তিত্ব ধারাবাহিকতা ও উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানের সঠিক পন্থা নির্দেশ করেছেন। পয়ামে মাশরিক্ষ : এটা বিখ্যাত জার্মান কবি গুয়েটের "দি ভান" কাব্যের জবাব। ১৯২৩ সালে এটা প্রথম প্রকাশিত হয়, এর পেছন-কার মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে ইকবাল ভূমিকায় বলেছেন, "আমি পায়ামে মাশরিক সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন অনুভব করিনা, "দি ভান" প্রকাশের ১শ' বছর পর এর আত্মপ্রকাশ। পাঠক স্বেচ্ছায়ই দেখবেন এর প্রধান উদ্দেশ্য সেসব নৈতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় বাস্তবতা তুলে ধরা যেগুলো ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মিক প্রেরণার সাথে সম্পর্কিত। প্রাচ্য. বিশেষত মুসলিম প্রাচ্যে, সবেমাত্র তার কয়েক শতাব্দীর দীর্ঘ বিভোর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠেছে। কিন্তু, প্রাচ্যের জাতিনিচয়কে বুঝতে হবে যে, আত্মার গভীরে বিপ্লব সংঘটিত না হলে জীবনের বাহ্যিক পরিবেশে বিপ্লব আসতে পারে না এবং মানব হৃদয়ে প্রথম অংকুরণ না হলে বাস্তবে নতুন জগত সৃষ্টি সম্ভব নয়। প্রকৃতির যে অমোঘ বিধান অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় আল কোরআনে বর্ণিত হয়েছে 'আল্লাহ সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যে জাতি নিজে নিজে তার ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে।" এটা জীবনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় দিক সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং আমার ফার্সী রচনা বলীতে এই সত্যটিকেই আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।"

গুয়েটে দুঃখ করেছেন, পাশ্চাত্য বিশ্ব দৃষ্টিভংগীর ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় জড়বাদী হয়ে পড়েছে এবং এজন্য আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হবার জন্য তিনি প্রাচ্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ১শ' বছর পর ইকবাল পাশ্চাত্য দেশ

সমূহের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষার বাণী প্রচার করেন। এতে তিনি নৈতিকতা, ধর্ম ও সভ্যতার গুরুত্ব তাদের স্মরণ করিয়ে দেন এবং আবেগ, অনুভূতি, গতিশীলতা, কামোদ্দীপনা ও প্রেমচর্চার অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ইউরোপ সমক্ষে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, আধ্যাত্মিকতা কী তা অনুধাবন করা না হলে জীবন উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে আদৌ পারে না।

জবুরে আজম ঃ মসনবী গুলশান-ই-রাজ-ই-জাদীদ এবং "বন্দেগী নামা"ও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত। ১৯২৭ সালের জুন মাসে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এটা মূলতঃ সৈয়দ মোহাম্মদ সাবিস্ত্রীর "গুলশান-ই-রাজ" এর অনুসরণে লিখিত। মূল গ্রন্থের ন্যায় এখানে ইকবাল তার মসনবীতে প্রথমে নয়টি প্রশ্নের অবতারণা করেন এবং নিজেই তার জবাব দেন। তিনি আধুনিক অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সত্তার একত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে দেখিয়েছেন এটা কিভাবে কর্মজগৎকে প্রভাবিত করে।

"বন্দেগী নামা" প্রকৃতপক্ষে গোলামী ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে একটি জোরালো অভিযান। দাসত্ব সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে এর শুরু এবং পরবর্তী পর্যায়ে দাসদের সুকুমার শিল্প সম্পর্কে এতে মন্তব্য রয়েছে। আজাদ মানুষের স্থাপত্যের ভূমিকা দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

জাভেদনামা ঃ ইতালীয় কবি দান্তের "দি ডিভাইন কমেডি', অনুসরণে এই গ্রন্থটি বিরচিত। ১৯৩২ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। জিন্দাবাদরূপে ইকবাল তার ওস্তাদ রূমী কর্তৃক পরিচালিত হয়ে খোদার সন্নিধানে গমনের এবং খোদায়ী নূরের উজ্জ্বলের সংস্পর্শে যাবার সম্মান লাভ করেন।

পাস চেহ বাইয়াদ কার্দ আয় আকওয়ামে শারক এবং মসনবী মুসাফির ঃ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ইকবাল তাঁর ওস্তাদ রূমীর ভাষায় সুসংবাদদানের প্রয়াস পান। "প্রাচ্য তার গভীর সুপ্তি থেকে জেগে ওঠেছে"। এখানেও রূমী ইকবালের মুখপত্ররূপে মুসা ও ফেরআউনের প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা করেন, তিনি তৌহিদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতিই জাতির জীবনী শক্তি। স্বেচ্ছামূলক দারিদ্র্য ও আজাদ মানুষের প্রেরণাদায়ী বিবরণী ও ব্যাখ্যাদানান্তে এই গ্রন্থে ইসলামী বিধানের ও সূফী ভাবধারার রহস্যাবলী বিশ্লেষণ করা

হয়েছে। তিনি ভারতীয়দের মতভেদে দুঃখ করে একতার বাণী প্রচার করেন। তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দান করেন, এবং আরবদের তাদের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সর্বশেষে পাশ্চাত্য বিশ্বের রাজনীতির ফলে প্রাচ্য জাতিগুলোর মধ্যে যে মোহ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব কাটিয়ে জেগে উঠতে তিনি প্রাশ্চ্যের প্রতি উপদেশ দেন।

মসনবী মুসাফির ঃ আফগান সফরের স্মৃতিচারণ। এতে সীমান্তের জনগণকে "ইসলামের মর্মবাণী" শিক্ষা করে তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে "খুদী" সৃষ্টির উপদেশ দিয়েছেন।

আরমুগানে হিজাজ ঃ ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে এর প্রকাশনা শেষ হয়। এটাতে দু'টো অংশ বিদ্যমান—প্রথমাংশে ফার্সীতে রচিত চতুষ্পদী ও খণ্ড-কবিতার স্থান পায়। যেমন "আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্যে" "রাসূল (সঃ)-এর সান্নিধ্যে" "মিল্লাতের দরবারে" "মানবতার দ্বারে" "সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে" ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কবিতাবলীতে এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে, কবি যেনো কল্পনায় হেজাজের মধ্যদিয়ে ভ্রমণ করেছেন—এসব ছোট কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবধারা গভীরতা ও অনুভূতির প্রখরতা।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশে রয়েছে "শয়তানের পরিষদ" এবং "পুত্রের প্রতি বৃদ্ধ বালুচের উপদেশ" চিত্র ও চিত্রকার "দোযখ" "গায়েবী আওয়াজ" এবং "মোল্লাজাদা জয়নাল ললাটি কাশ্মীরীর কবি প্রতিকৃতি" প্রভৃতি উর্দু কবিতা। এসব কবিতায় আধুনিক যুগের কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। কতিপয় সুরক্ষিত গুঢ় রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন এবং নির্ভুল পথ নির্দেশদানে এগুলো সাহায্য করে।

দি কনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম ঃ এটা মাদ্রাজ হায়দরাবাদ রাজ্যে ইকবালের প্রদত্ত ছয়টি ভাষণের সংকলন। ১৯৩০ সালে এটা প্রকাশ পায়। ১৯৩৪ সালে অক্সফোর্ড ভার্সিটি থেকে প্রকাশিত হয় সংস্করণে সম্ভাব্য রদবদলসহ একটি অতিরিক্ত ভাষণ সন্নিবেশ করা হয়। এ গ্রন্থের কতিপয় প্রধান বিষয়বস্তু হলো ঃ জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, দর্শনের নিরিখে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, আল্লাহর ধারণা, প্রার্থনার মর্মকথা, মানবীয় অহম এবং তাকদীর, স্বাধীন ইচ্ছা, মুসলিম তমদ্দুনের মর্মবাণী, ইসলামের

আন্দোলনের নীতি মানে ইজতিহাদ, এতদসম্পর্কিত ভাষণে ইকবাল মানব সমক্ষে আধুনিক ইসলামী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারূপে প্রতিভাত হয়েছেন। এসব বিষয়াবলী তিনি ইসলাম ও আধুনিক দর্শনের আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আধুনিক যুগের চিন্তাবিদদের জন্য ইসলামী গবেষণার নতুন দিগন্ত উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছেন।

দি ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিকস ইন ফার্সিয়া ঃ এই থিসিস লিখেই তিনি ডকটরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০৮ সালে এর প্রকাশ ঘটে, ইকবালের এ গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারস্য দর্শনশাস্ত্রের ভাবী ইতিহাস রচনার ভিত্তি নির্মাণ করা, একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থে মৌলিক চিন্তা আশা করা উচিৎ নয়, কারণ এর লক্ষ্য ছিল পুরোপুরিভাবেই ঐতিহাসিক। তবুও দু'টি কারণে আমি কিছুটা বিশেষ বিবেচনা দাবী করি (১) এতে আমি পারস্য চিন্তাধারার যুক্তিনির্ভর ধারাবাহিকতার সন্ধান দিতে প্রয়াস পেয়েছি এবং এই বস্তুটি আমি ব্যাখ্যা করেছি আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের ভাষায়, (২) আমি সুফীবাদকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছি এবং এর আবির্ভাবের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং সাধারণভাবে গৃহীত অভিমতের বিপরীতে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে, সুফীবাদ তদানীন্তন যুগের বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি এবং সুপ্ত আত্মাকে জীবনের উচ্চতর আদর্শে উজ্জীবিত করে তুলতে এটা সহায়ক হবে।

এ সোসিওলজিক্যাল সার্ভে অব দি মুসলিম নেশন এবং দি ইসলামিক ক্যাপিট্যাল ঃ

এগুলো ইংরেজীতে প্রদত্ত ইকবালের দু'টো ভাষণের শিরোনাম, এগুলো উর্দুতে অনূদিত হয়েছে।

শিকওয়াহঃ এ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে এর প্রথম প্রকাশ বেরোলে ইকবালের ওপর তদানীন্তন ওলামা সম্প্রদায়ের ভুল ধারণা হয়। যেহেতু ইকবাল আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত, সেহেতু সবশ্রেণীর মানুষ তাঁকে কাফির ফতোয়াও দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কবি অভিমানের স্বরে মহান রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে কৈফিয়ত চেয়েছেন। তিনি উপমার চমৎকারিতায় গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছেন।

জওয়াব-ই-শিকওয়াহঃ এটিও ইকবালের উর্দু রচনাবলীর অর্ন্তভুক্ত। এতে ইকবাল শিকওয়ার প্রত্যুত্তর করেছেন মহান প্রভুর পক্ষ থেকে, তিনি এমোনভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন যে, কেউ এর প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত পাননি।

এসব গ্রন্থ ছাড়াও ইকবালের পত্রাবলীর কয়েকটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। অনায়াস রচিত সাবলীল ভাষায় এইসব পত্র ভাব-কল্পনার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তমান। এখানে স্মর্তব্য যে, কবির ইংরেজী ও উর্দ্দুতে লিখিত বেশ কিছুসংখ্যক রচনা বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলো ছাড়াও তাঁর অন্য সব ভাষণ-বক্তৃতা-বিবৃতি ও বাণী বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হয়ে কতিপয় সংস্থার উদ্যোগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে "স্ট্রে রিফেক্সনস" "গুফতারে ইকবাল" "মাকালাত-ই-ইকবাল" "হরফ-ই-ইকবাল" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইকবাল স্মরণে

আল মাহমুদ

তোমার কথার বাতি জ্বলে ওঠে অন্তরে আমারও
দেশ নয়, কাল নয়, মানুষের ঈমানই সম্বল।
যেনবা ঈগল এক মেঘের গম্বুজে উঠে গিয়ে
দেখে কারো ঠাঁই নেই এই মহাশূন্যের ভেতর।

ইকবাল মানেই হলো স্বস্তির ভেতরে পথ হাঁটা
ভ্রাতৃত্বের রজ্জু ধরে টান দেয়া আত্মার নিভৃতে।
আল্লাকেই প্রশ্ন করো, করুণানিধান যদি তুমি
কেন তবে আমাদের আহাজারি পৌঁছবে না
আরশে তোমার ?

ইকবাল, আলোর স্তম্ভ, অন্ধকার উপমহাদেশে
আশার গর্জন তিনি কিংবা মৃদু প্রেমের গুঞ্জন
স্বপ্নের সজল দৃষ্টি দেখে দূর গ্রহের জগতে
সকলই বিনাশমগ্ন কিন্তু কেউ ধরে রাখে সবই।

মৃত্যুর নেশার মাঝে আসে যায় সহস্র বৎসর
সহস্র ইঙ্গিত ভাসে এক মহা বিলুপ্তির গানে
তবু কেন মানেনা হৃদয় তার মৃত্যু এক শান্ত পরিণাম
স্বাভাবিক, শান্ত এক অদমিত আত্মার উড়াল।

অনুরোধ

আজাদ চৌধুরী

(মহাকবি ইকবাল স্মরণে)

অনুরোধ ! অনুরোধ !! অনুরোধ !!!
দেশ ও বিশ্বের –
জ্ঞানী-গুণী, সুধী সমাজ, লেখক-লেখিকা
কবি-শিল্পী-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী-তরুণ-তরুণী
সাংবাদিক-মওলানা-পাদ্রী-পণ্ডিত
বিশ্বের নেতা-নেত্রী, নর-নারী, মা-বোন
সবার প্রতি অনুরোধ !
প্রতিবাদী হতে অনুরোধ !!
প্রতিকার করতে অনুরোধ !!!

০ ০ ০

সভ্য জগতে—
আমরা ঘরে ঘরে পশুর চেয়ে ঘৃণ্য কেন ?
সমাজে মনে আজ অশান্তির দাহ কেন ?
বিবেক-বুদ্ধি-মৈত্রী-মানবতা
আজ কোথায় ?
অসৎ চরিত্রের বিস্ফোরণে
আমরা ন্যাকেট
আমরা বর্বর
পাপের শাস্তিই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত !

০ ০ ০

গোটা বিশ্বের—
নারী-পুরুষের মান-ইজ্জত আজ জঘন্য
এইডস, সিফিলিস সংক্রামক ব্যাধিতে
ভেজাল শিক্ষা-সংস্কৃতি সাহিত্যে
শিশু থেকে শুরু করে সবার মস্তিষ্ক আজ বিকৃত
আমাদের চোখ-মন-মাথা অপবিত্র
আমরাই আইনের রচয়িতা
হাদিস-কোরান সবই বানোয়াট
ধর্ম আজ অধর্ম
ধর্ম অভ্যুত্থান মক্কা থেকে শুরু করে
সমগ্র মুসলিম-অমুসলিম
রাষ্ট্রের জনগণ আজ পুরো ধ্বংসের পথে
এ ধ্বংসের মূলতঃ কারণ
নর-নারী আজ আব্রুর বাহিরে
শান্তির বদলে
অভিশাপ-ই আমাদের সত্যিকার পাওনা নয়কি ?

০ ০ ০

পাপ আর পাপ
কে মা, কে বাপ, কে ভাই, কে বোন
কে ফুফু, কে খালা, কে চাচি
কে চাচা, কে ভাতিজী, কে ছাত্র, কে ছাত্রী
কে বর, কে কনে, কে জামাই, কে শাশুড়ি
কে শ্রদ্ধার, কে স্নেহের
বিচার নেই ;
নারীর প্রতি পুরুষের
পুরুষের প্রতি নারীর
এতিমের প্রতি অভিভাবকের
কারো প্রতি কারো বিচার নেই
দয়া নেই মায়া নেই

শুধু অন্যায় ধর্ষণ, অপহরণ, ব্যাভিচার-পাপাচার
আর অবিচার !

০ ০ ০

মদ-গাজা-ভাঙ-আফিম
সিনেমা-ভিসিয়ার আর
নর-নারীই কি যথেষ্ট !
সচেতন হয়ে বিবেক খোলে দেখো
নিজেকে যাচাই করো
আল্লাহ্-রাসূলকে স্মরণ করো

০ ০ ০

পাপ-মৃত্যুর কথা আমরা চিন্তা করি কি ?
বেহেশ্ত দোজখের কথা
আমাদের মনে পড়ে কি ?
কোরান-হাদিসের সত্যাদর্শ আর কে মানে ?
আখিরাতে আর কিসের ভয় ?
মৃত্যু আমাদের মিথ্যে প্রোপাগাণ্ডা
অর্থ বিলাস-বাসন
যুদ্ধ-বিগ্রহ হিংস্র হানা হানিই
আমাদের চাবিকাঠি
দৈনন্দিন রকমারী প্রাসাদ বৃদ্ধিই
আমাদের সভ্যতা
চরিত্র-চিত্রণে আমরা
পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট
আধুনিক বিশ্বে আমরাই প্রকৃত অপরাধি
শান্তির মারণাস্ত্র !

Message of Iqbal to human being

Dr. A. N. M. Raisuddin

Philosopher and poet Allama Dr. Muhammad Iqbal (1873—1938) was a great man, a muslim of the highest quality and a Sufi, Spiritualist of uper grade, Hence, his messege or call to human being was the message of peace through love. It is in fact, the message of Islam. Iqbals philosophy is the Philosophy of love and peace. A man Should be a real man embodying with all qualities of human being and that is possible only through love ie, love for the creator through the love of His creations. Man having inhuman character can not be a man. Iqbal's message to human being is to make themselves **Mumin**, believer in its real sense of the term and **Insan kamil**, Complete man. Because man are of two kinds : (a) man in shape and (b) man in character. A man in shape can not be a man until and unless he attains the character and qualities of human being, Which is not possible without entering into Islam fully. This may also be termed as complete surrender to the will of Allah. Allah declares in the Qur'an :

ادخلوا فى السلم كافة

"You all enter into Islam fully," He also discloses the qualities of the belivers and says :

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايته
زادتهم ايمانا

"For believers are those who, when Allah is mentioned, feel a tremor in their hearts, and when they hear His sings rehearsed, find their faith strengthened, and put (all) their trust in their Lord. (8 : 2).

Iqbal's message to mankind is to attain humanity, and that is possible only when they will have love for their creator, Allah, the Almighty. In fact, without the love of Allah no one can be a man in its real sense of the term. And so far the question of believer is concerned love for Allah is only the way to attain His nearness. Allah says;

والذین امنوا اشد حبا لله -

"But those of faith are overflowing in their love for Allah" (2:165).

That is why Iqbal gave utmost importance on the development of Ego and purification of soul. In his Khudi Iqbal said : "Develop your self so strong that Allah may ask you of your desire before writing your fate." And for the same purpose Iqbal stressed on the attainment of love of Allah through the love of men. He said : "When the self is made strong by love its power rules the whole world". Man having love of Allah becomes so strong because of strength of soul. This soul can attain unlimited power if it could be submitted fully to Allah, the Almighty. In fact, a man can not be a real man having a close relationship with Allah until and unless his soul is purified and enlightened with His love. And a man having such quality is not afraid of anything in this world. Dr. Iqbal explaining such a condition of a man said:

عشق را از تیغ وخنجر باک نیست = اصل عشق از آب وباد وخاک نیست

"Love is never afraid of any weapons because the origin of love is not the body of human being," Love is not originated from body, rather it is originated from Allah through the soul. Allah says :

یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی

They ask thee (O Muhammad S.) concerning the spirit (Soul of inspiration) say : The spirit (cometh) by commad of my lord Hence the spirit or soul embodying with the love of Allah is

very powerful, which has nothing to fear but Allah. In fact, everything in this world is being controlled by love. If one thinks on how a beautiful woman attracts heart of a youngman ? How fragrance of flower attracts the mind and heart ? How tune attracts the hearts ? All these are with the unseen attractions of love, It is because of this love for which Ibrahim (a) not only sacrificed his beloved son, Ismail but also sacrificed himself in the hell of Namrud. And also because of this love Ibrahim (a) found himself in ever excellent condition of his life in the hell of Namrud.

So very rightly one can say that all destructions are because of love and all creations or constructions are because of love. Of course destruction and construction depends on the misuse and utilization of love. Those who develop their love for the cause of Allah through the love of human being become successful. The supreme love is for Allah and that may be done through the love of human being. The Prophet of Islam, Muhammad (S.) made it clear and said :

لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس

"Allah does not take mercy on a person, who does not take mercy on other human being." But the supreme love must be for Allah. He says : As already mentioned,

"But those of faith are overflowing in their love for Allah"

(al-Qur'an 2 : 165).

And it becomes clear from the philosophy of Iqbal that his message to human being is to attain human quality through human love and finally to attain the love of Allah, the Almighty. As a matter of fact, this is the philosophy behind the message of the Prophet of Islam, Muhammad (S.) also, which may be made clear through his following two sayings ;

First : - The Prophet (S) said :

لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین

"None of you could be a real believer until and unless I am more beloved to him than his parents, children and all man." Here though the love is for the Prophet (S) mentioned in the Hadith as Prophet but this love is also for the cause of Allah. Another Hadith of the Prophet (S) made it clear. The Prophet said ;

من احب لله وابغض لله فقد استکمل الایمان-

"One who loves for the cause of Allah and hates for the cause of Allah, his belief has been completed." So it appears that the main theme of Iqbal's philosophy is the establishment of men's relation with Allah through love. And for the same purpose his message to the human being is to purify the heart, whithout which establishment of relation with Allah is not possible. He regretted on the spiritual down fall of the Muslims and said ;

رہ گیا رسم اذاں روح بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

"The tradition of **Adhan** remained as it was but the spirit of Hadrat Bilal (R.) remained no more. Philosophy remained as it was but the philosophy (dictation) of Ghazali remained no more." Iqbal also reminded the Muslim of their glorious past so that they will be able to purify their hearts, and hence, social equality, brotherhood and friendship could be re-established forgetting all petty differences in them. He said :

* آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز = قبلہ رو ہوکے زمین بوس ہوئے قوم حجاز
* ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز = نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز
* صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوے = تیری سرکار کو پہونچے تو سبھی ایک ہوئے .

Which means, while performing **Salat** the Muslims used to stand in a straight row, where there is no differences between

the ruler and the ruled. The muslims demonstrated a unique example of equality, brotherhood and discipline (in the **Salat**) ignoring their social differences of rich and poor. Rather all are equal before Allah to get their due right.

Thus, the Muslims established a peaceful society where humanity prevailed, at the same time they established a close relation with Allah through love for Him practising **Salat**, which purifies the heart and enlightens it.

It is high time for us to bring into practice the teachings of Islam to achieve love of Allah and to attain peace here in this world as well as in the hereafter. And for the same purpose Iqbal's message to the human being, 'ie' the philosophy of love for the cause of Allah will definitely be proved useful for all of us.

Iqbal : Dialogue The West

M. Rafiq Khawar

OF all the front-rank personalities who have appeared in the East in modern times, the late Dr. Mohammad Iqbal, poet-philosopher, strikes as the most Western in his thought, personality and art, in spite of his having his grass-roots in the East and being a staunch follower of Islam and steeped through and through in it.

It may appear to be a paradox but it can pe categorically said that he is strongly West-oriented with his bi-polar personality inclining as much to the west as the East. This comes out clearly if we compare him with other outstanding figures who have appeared in the East during the period of European domination up till now and have played a significant part in their respective spheres. For instance, Rabindra Nath Tagore, Radha krishnan, Raja Ram Mohan Roy among the Hindus, and Sir Sayyed Ahmad khan, Jamalud-Din Afghani, Abul kalam Azad and Muhammad Abduhu among the Muslims. The most intellectual of them, Tagore and Radha krishnan have, no dcubt, exercised some influence but there has not been so vital and varied impact which continues to grow and extend in ever-widening circles and takes the future even in its tremendous sweep. It is kinetic and farreaching in nature and has the potentiality of shaping the desting of the human race. The other figures remain eastern.

Iqbal, with his double axis operating equally in both hemispheres, belongs to both. He has a home in both and is as much of the west as of the East, as we can very well see from the increasing interest he is evoking in all countries of the west and the prolific nature of books and articles written cn him. Iqbal's is, in fact, a personality with so many dimensions in thought, poetry and

culture because of which he emerges as a wonderful interface of East and West. His genius may well be described as East-West continuum. He maintained a dialogue between the two which comprehended all their points of Interest. It was a colloquy intrinsically pervasive, progressive and penetrating in nature. This is becasue his mind was extremely synthetic. He absorbed heterogeneous elements from all quarters and shaped them a new in the crucible of his highly assimilative mind. From the very beginning the tendency lay towards more and more absorption and more and more moulding into ever new dynamically charged creative shapes.

Iqbal's dialogue with the West began very early as a young man seeking education. The times he lived in were of nascent, growing contact between the then East and West and his mind was open to the influences proceeding from the West. His disciplines were allthought-provoking and mind-moulding viz., literature, mainly English, philosophy and economics. Like all his contemporarles, the English romantics were the first to sway his young, receptive mind.

This had a tremendous effect fot it strongly turned his mind Westward, which was eager to assimilate more and more the Western manna. A new window—magic cassment, shall we call it ? —and new vistas were flung open so that he, like keats, on reading Chapman's Homer, had the vast panorama of a rich demesne of gold opened to him. This was a lifelong influence. We find this reflected in his early poems on Thomas Arnold, Shakespeare and various romantics like Shelley, Wordsworth, and across the pacific, Emerson.

Much of his early poetry consists of gleanings fron English poets from whom he draws constant inspiration. Like them he is the first to dwell upon nature and its phenomena, an element hitherto absent in Eastern poetry, particularly classical persian and Urdu

poetry, th͏e twin muses which dominated the scene from the very beginning.

This incipient influence prepared a propitious ground for further advance to the homeland of the new culture, the West. As the poet has said in a poem, love for the treasure of knowledge dragged him to Europe. His very first book was on economics which he did not find a dismal science like Carlyle but relished it as a very stimulating branch of knowledge which had a strong, abiding influence on his mind, signs of which sprang up again in his writings so far so that some critics pounce upon them to place hin among Carl Marx's votaries despite his calling socialism equality of the stomach.

Shelley was one of his hot flames because of his fiery spirit and we fond his ideas and images flashing out occasionally. He was impressed by Milton's impressive personality and grand organ notes which rose to sublime heights. Iqbal intended to write a poem analogous to the **paradise Lost**. Even Mathew Arnold, whom he considered devoid of suggestion, provided sentiments for his elegy on the poet **Dagh**, his teacher. william Cowper was another poet who drew upon, even the Caption of one poem being "Those Asleep Below the Earth, reminding of "Elegy in a Church"

PHILOSOPHY OF IOBAL

The other pialogue nroceeded from Iqbal's profound study of philosophy as a special subject for his Master's Degree. His was an innately refleetive mind which this intensive study sharpened all the more and made him avid for larger intakes of this favourite, delectable repast. This was as far as things could go while still remaining in the East which he described in his poem on Thomas Arnold as a golden chain which bound him like a captive. But his visit to Europe in the highly sensitive time of youth, proved a veritable open sesame toEuropean Alladin's

cave of thought, culture, life and climate. He was now in the intellectual home of his desire and fond dreams and drew upon it to the fullest extent of his receptive capacity. In fact, he was in toe thick of the life, spirit and culture of the wast. He was one with its people in mind and thought—actually one of them. He was in touch with the master minds of Europe not only through the Inert medium of their works but was in contact with the living thinkers as a live person He was in the company of the common as well as the elite. He thought with the outstanding thinkers and watched the various movements and activities which marked the Europe of the day. He met Bergson and had a talk with him about subtle problems of philosophy. Bergson's views on life and the elan vital had a strong effect on his mind. Hence the rhapsodies on life which fill his poetic works.

In fact Iqbal's own phliosophy in a modification of Bergson's In as much as he does not consider life to be an aimless movement but one directed and motivated. The age resounded wich the talk on Tjme and Self. It was because of his immersion in Western philosphy and its terminology that he adopted the word Khudi as fhe axiological basis and nomenclature of his philosophy which was wholly contrary to its traditional connotation in Eastern circles and was looked upon as undesirable for it meant the assertion of the human self and stood for egotism. This adoption of Khudi or self is by itself sufficient to say how Iqbal was under the dominating influence of the west. Nietszsche's Idea of superman and his caustic criticism of Christianity and bold ideas of right and Worng and power made a vital impact on Iqbal. He read voraciously the writings of Goethe, Einstein. whitehesd. Mc Taggart, in fact, all the thinkers, men of letters and scientists who figured prominently and had something significant to say. Iqbal's mind, thus, became a repositary of all that filled the atmosphere of Europe. It was something of which he had first-hand experience, which he observed with his own eyes, perceived

through his mind and thought over deeply both like a student aud critic. This was not the inert, dry-as dust knowledge of an academlcian but that of a live person. The resulting amalgam was instinct with life.

Thus Iqbal became steeped in the entire contemporary scene and moved like a fellow traveller along with the whoie group of those intellectual figures who represented the thought, culture life and spirit of the then Europe. He thought and wrote just as others were doing, contributing to the onward march of thought. His was role of a pariticipant and a collaborator.

Iqbal's Contribution

Iqbal's contribution was most vital because he gathered and amalgamated all the material stuff of all the members of the team and pushed it further from the point it reached him. He thus stands as one who determines the future pattern of life and human destiny. If hecriticises western culture, it is not out of any malevolent motives or as a polemical upholder of a particular faith but as a lover of mankind. Have not so many other writers and thin kers of the West itself severely criticised western culture. For instance, Spangler, Nietzsche, Bertrand Russel and Rene Guenon.

How Iqbal had a dialogue with the west, is obvious from his glorification of life in the very tone and sprit of Bergson. The time-space and relativily concepts of Einstein are frequently mentioned by him. He discussed the capitalishe, Socialist, Communistic and systems. His "**Payam-i-Mashriq**" was written in response to Goethe's "**Divan**" of ihe East and"**Jovid Nameh**" as a counterpart of Dante's **Divine Coemdia**. There is a whole section of the **Payam** casting light on all the prominent aspects of the west—personalities, systems, movements, theories, concepts, in a very masterly and comprehensive manner. It is a veritable picture. gallery and museum of West. The West owes a deep debt of gratitude to Iqbal for thus spotlighting it.

Greatest Work

Iqbal's greatest work, "**Reconstruction of Religious Thought in Islam**", is in English wich embodies as much of Western thought as that East, that is Islam. It is not an essay in polemics or dogmatic advocacy of Islam but a reasoned presentation of a case in a very liberal manner wich can be read with much pleasure and profit by any reader.

As a part of doing justice to the West, Iqbal has given an elaborate account of the Eastern Movement in Europe in the 19th century and introduced its principal figures for the first time Thus carrying the dialogue to its maximum limits, Iqbal has converted it into a super-dialogue, and that is as far as things could go. He stands at the end-point of the East and West, past and present, at the frontier of the hitherto no-man's land and beckons us like a brilliant tower of light to advance boldly, hailing new prospects which we cannot at present think of, or visualise. Like Browning, Iqbal's watchword, too, is: **Excelsior.**

**Mr. M. Rofiq Khawar is an authority on Iqbal, He has written on his life gnd philosophy, in english, Persian and Urpu and translated some of his important worKs into English.

Iqbal, the man and his message

S. G. Jilanee

One hundred and ten years ago, was born the man whose dream would one day alter the map of India and carve out a country of ninenty million Muslims. That man was Muhammad Iqbal.

Early life

Iqbal was born at Sialkot, an important industrial city of the Punjab, in 1877 on the 9th November in a middle class family. The family had migrated from Kashmir when his grandfather settled at Sialkot.

According to the usual practice among orthodox Muslims he was, first, sent to a mosque school to learn the Quran, then, to the local elementary school. The spark of his intelligence and his perspicacity attracted the attention of an erudite scholar, Meer Hassan, who encouraged Iqbal greatly.

Iqbal studied at the Scottish Mission College, and the Oriental College, at Sialkot and Lahore respectively, and took his M. A., in Philosophy in 1897.

During this period he came under the influence of his teacher sir Edwin Arnold who, finding in Iqbal, a receptive mind introduced him to the best in Western thought.

After a brief stint at the Government College at Lahore as Reader in Philosophy, Iqbal weut to England in 1905. During his three years' stay in Europe, he studied Philosophy at Cambridge, and Law at the Lincoln's Inn. He also stayed for sometime in Germany and was awarded Ph.D. by the Munich University for his thesis on the "Development of Metaphysics in Persia".

Ipbal completed his education in England and was called to the Bar in 1908. Thesame year he returned home. From then on, until 1924, he practiced law.

These years the saw First World War; the humiliating defeat of Turkey; the end of the "Caliphate", which had been the symbol of Muslim unity; and the Muslims all over the world lay prostrate. In India, the vengeful policies of the British, in the aftermath of the struggle for Indεpen dence of 1857, had all but crashed the Muslims. The same was true of the entire muslim world from Indonesia, (then Dutch East Indies), to Algeria and Morocco.

These events stirred Iqbal to the core. They fired his imagination. And Iqbal who had the spark in him from his early youth, began to pour forth poetry charged with rassion and fire.

From writing poems for children and composing poetry in the traditonal style of the Urdu and Persian poets, singing of roses and nightingales, and love and passion or panegyiics for the Kings, Iqbal turned vigorously to arouse the Muslims with the whiplash of verses.

:politics

In 1927, he was elected to the Punjab Legislative Assembly and had, ever since his return from Europe, been associating himself with the political developments in the country. But, side by side with his down-to-earth actfvities as a lawyer and a politician, Iqbal had also been drinking deep at the fountain of knowledge, assimilatirg the works of the Urdu, Persian, Sanskrit English and German masters; poets, philosophers, mystics and sufis, and adove all, imbibing the true spirit of the Quran.

Iqbal was also touched by the Hindu-Muslim disunity in India in spite of best efforts of the Muslim politicians to promote peace

It Was Sir Edwin Arnold (1832-1904) and "not Sir Theomas Arnold (1795-1842)", according to Dr. S· May- "Iqdal His Life And Times".

and harmony. Jinnah, the founder of Pakistan, was himself an ardent member of the All-India Congress, a Hindudominated and Hindu-oriented body. Then there were the Ali Brothers, and a host of others. Iqbal lamented this mutual discord in his poems and preached love.

But something in the deepest recesses of his heart had told him long ago that Hindu-Muslim unity was a fantacy. He wrote to Ghulam Qadir Farrukh of Amritsar, as early as 1909, describing the Hindu-Muslim unity as "romantic but impracticable".

The Pakistan Concept :

The chasm between the majority Hindus and the Muslims, who were the largest single minority, had widened since All-Indian Muslim League was founded in 1906, to such an extent as to prove unbridgeable. The great divide had been formed. New alternatives were, nevertheless, being tested to bring about a working political arrangement so that both communities could live in peace in India.

But Iqbal had a vision. He could anticipate the shape of things come, both nearer home as well as abroad. Says he, in a verset "What the eyes see, the lips are unable to from inte words. I am wonderstruck to think how vastly the world will change !" And "just as Neitzsche foretold the rise of Russia in the twentieth century; and Tennyson, the development of civil aviation and areial warfare, Iqbal foresaw the birth of Pakistan".

On the 29th December, 1930, Iqbal presided over the session of the All-Inddia Muslim League at Allahabad. There in his presidential address he described "self government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-west Indian Muslim state" to be the "final destiny of the Muslims, at least, of North-west India."

Thus, the seed had been sown. It took seventeen years to grow and fructify. The concept which on that day in 1930 was, at best oneiric, a poet's dream, became a reality on the 14th Angust, 1947, when Pakistan emarged on the map of the world as an independent, sovereign Muslim state in the North-Western (and Eastern) part of what, earlier was, British India.

Iqbal even had a premonition that he may not live to witness the realisation of his dream. In a verse, he said. "If the good news of the dawn of spring be not destined for me (O. God !)/Make this) half-consumed flame of my breath a bird to sing about the spring." And, true enough, he could only sing of hope, of the spring which was to come, but when it came in 1947, he was not there to enjoy it, having died in 1938.

IQBAL'S MESSAGE :

Iqbal wrote poetry in Urdu and persian. The collection covers 11 books ; four in Urdu. and seven in Persian. His English writings consist of seven lectures on "The Reconstruction of Religious Thougnt in Islam."

Iqbal had observed that the way of life in Europe. consisted mostly of the pursuit of science and technology and wealth, but was devoid of "spirt". He noted, like Wordsworth before him, how "Getting and spending we have laiid waste our souls/A sordid been" At home, he observed how his laments at communal disunity and sermons for harmony proved futile before the seething Hindu-Muslim hatred generated by the Hindu militant-fundamentalist,—Bal Gangadhar Tilak, Bankim Chatterjee, Dayanand ond others.

Iqbal, now turned his attention to bringing a re-awakening among the Muslims, not only in Indiu but throughout the world.

So, unlike his predecessor, Hali, instead of mourning the sloth and degeneracy of his co-religionists, his poetry turned into an impassioned call for action.

His message, the shafts and the embers, are scattered in his poestry, but consolidated in one place, it can be found in his long poem "the Secrets of self."

The impression of sheer strength which the poem leaves on one's mind is impossible to convey. "Awake, Arise, Know and Realise thyself." That is what it says. "Back to the Quran, Back to Mohammad", says he. He preaches the restoration of the lost unity of the Muslims. They know not the bonds of country; they are the dew of the smiling dawn. They are like the rose, with many petals but one fragrance. They must unite as he defenders of the ka'ba which is the centre of their faith. And the love of the prophet should be the common bond. He should be the flame around which they must dance with selfless, devotion to be consumed by their love.

Iqbal hsd no patience with the enervating platonic or Brahmanic philosophy, where the secret of life was, to die. Man should according to Iqbal, derive his spiritual sustenance from the world of strenuous action. For the Muslim, the desirable way of life is not the mountains and caves; it is in the performance of normal chores, joining and serving for a ole use In appearance, though, silver may be bright and new, but it stains the hands andclothes. So, no mad scramble for riches. And., a Muslim must not beg. Begging and accepting obligations form others, destroys one's seif-respect. How abundantly the truth of this message is being demonstrated today in the economics of "foreign aid!"

CONCLUSION :

In sum ; Iqbal preaches thjs message :

(a) Man's greatness depends on the loftiness of his own "self", rather than on his social status, ancestry, nationalty, race or colour.

(b) when man frees himself from the considerations of gain or loss (=intellect), and surrenders his being to some great cause (= Love), then his all-consuming faith leads him to perform such acts as wou d not be possible with ordinary, material resources.

(c) Life is perpetual motion. When this motion is subordinated to "Faith", then man's personality (ego, self) becomes stronger ; and,

(d) As man's self (ego) develops and gains strength, he gets nearer to Good, till a stage is reached when man's wishes coincide with and become identical with god's will !

Thus, where as secrates said ; "Know thyself" ;Iqbal says ; "Realise thyself."

ওয়াশিংটনে ইকবাল সোসাইটি-কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইকবাল মৃত্যু দিবস পালন (২১-৪-৬৬)-উপলক্ষে ডক্টর মিস্ শীলা ম্যাকডোনফ বলেন ঃ

ইকবাল 'আর্ট ফর সেক (ললিত কলার বিকাশেই ললিত কলার চরিতার্থতা)-পন্থীদের একজন ছিলেন না; কেবলমাত্র আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-প্রচারণার উদ্দেশ্যেও তিনি লেখনী ধারণ করেননি। তিনি বরঞ্চ তাঁদের দলের একজন যাঁদের অন্তরে সৃষ্টিশীল আবেগ দুঃখজনক হয়ে দেখা দেয়। কেননা, তিনি তাঁর প্রেরণা অন্যে সংক্রমি করতে চাইতেন —এবং সাথে সাথে গভীরভাবে অনুভব করতেন যে, ভাষা এবং ভাষণরীতি তাঁর অন্তরের আবেগকে মূর্ত করতে অসমর্থ। নিজ উপলব্ধিকে প্রকাশের বেলায় ভাষার দৈন্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

ভাষার কঠিন আবরণের অন্তরালে সত্যের কন্ঠরোধ হয়ে আসে।

এ প্রসঙ্গে টি, এস, ইলিয়টের অনুযোগও আপনাদের মনে পড়বে। তিনিও বলেছেন যে, ভাষার গুরুভার কবিমনকে উন্মুক্ত করে ধরবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে। তাঁর কথায় ঃ

Words stdrain.

Crack and sometimes break under the burden.

(এ বোঝার চাপে, ভাষা মচ্‌কে যায়, দুমড়ে যায়, কখনো বা ভেঙে পড়ে।)

ইকবাল ও ইলিয়টের মধ্যে যে সব সাদৃশ্য রয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। দু'জনেই নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ধর্মীয় কবি। এই দুই আন্তরিকতাধর্মী কবিই মনোভাব প্রকাশের বেলায় ভাষার অসামর্থ্যহেতু নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়েছেন; দু'জনেই অন্তরের দিব্যদৃষ্টির ভারে নিজেদেরকে পীড়িত বোধ করেছেন। ইকবাল বলেছেন ঃ

ঈমান হলো অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপনোন্মুখ ইব্রাহীমের মতো,
অন্য কথায়—আত্মসম্মানবোধ ও আল্লাহ্-এ তন্ময়তা।
আমার কথা শোনো!

ইকবালের এ ঐকান্তিকতা তাঁর ধর্মবিশ্বাসের গভীরতার নিদর্শন। ইব্রাহীমকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার কুর্‌আনীয় কাহিনী থেকে তাঁর

যে অবিচল ধর্মবিশ্বাস ও আল্লাহ-নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ইকবাল চেয়েছেন জীবন যাপন ক্ষেত্রে—এবং তাঁর নিজের বেলায়, তাঁর কাব্য প্রচেষ্টায়—আহবান করতে। ইকবাল বিশ্বাস করতেন : যারা সাহসিকতা ও সৃষ্টিধর্মী প্রবণতা নিয়ে অস্তিত্বের অভিব্যক্তিসমূহের সাথে মুকাবিলা করতে চায়, তাদের জন্য জীবন হলো যেন একটি সর্বক্ষণ প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা—যা তাদের বিশ্বাসকে অনবরত যাচাই করে চলেছে। তিনি যখন বলেন "আমার কথা শোনো!" তখন তিনি নিশ্চয়ই বোঝাতে চান যে তাঁর লেখার একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে; এবং তা হলো আমাদের প্রচলিত জীবন যাপন পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া, আর আমাদের অন্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার করা।

আমার মনে হয়, আমাদের ইকবালকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত কর্দোভা মসজিদ পরিদর্শন করে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে। এ প্রসঙ্গে আমি 'দিব্যদৃষ্টি অথবা ধ্বংস'—কথাটার ওপর জোর দিচ্ছি। এর কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, এ থেকে বোঝা যায় মহান কর্দোভা মসজিদ দেখে তাঁর মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল। সে উপলক্ষে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হলো ত তাঁর চেতনায় কাল-সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতিকে সম্যক-রূপ দান করেছে। একে এলিয়েড উল্লেখ করেছেন 'ইতিহাসের ভয়াবহতা' বলে। মুসলিমের চোখে এ সমস্যার সমাধান কি তা-ও আমরা ইকবালের কাছে জানতে পারি এ প্রেক্ষিতে। 'দিব্যদৃষ্টি অথবা ধ্বংস'—এর মধ্যেই রয়েছে কর্দোভা মসজিদ ইকবালকে কি বলছে তা বোঝবার চাবিকাঠি, অন্য কথায়—ইকবাল পরম আকুলতার সাথে আমাদেরকে কি বোঝাতে চান তার হদিস।

দ্বিতীয়তঃ, কথাটি ইংরেজীতে পাওয়া যাবে 'বুক অব প্রভার্ব্স্'-এ এভাবে : Where there is no vision, the people perish (যেখানে দিব্যদৃষ্টি নেই, সেখানে মানুষের অন্তিম দশা)। প্রতীচ্যবাসীদের যাঁরা ইকবালের উদ্দেশ্যের অনুধাবন করতে চেষ্টিত, তাঁদের জন্য বুঝা প্রয়োজন যে, তাঁর লেখায় রয়েছে কিছুটা ভাববাদী আমস (Prophet Amos) অথবা ব্যাপ্টিস্ট জন (John the Baptist)-এর ব্যঞ্জনা। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, প্রাচ্য দেশীয় কবিদের ভাবধারা মৃদুমধুর ও আবেগপূর্ণ। ইকবাল অস্পষ্টতা ও তারল্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তাঁর শর্তানুযায়ী তাঁকে

বোঝবার চেষ্টা করলে দেখতে পাবো যে তিনি প্রায়শঃই দৃপ্ত ও কঠোর। তাঁর বৈশিষ্ট্য, আমাদের কাছে অপরিচিত হবার কথা নয়। কেননা, সেমিতীয় ভাববাণীর একাগ্র প্রাখর্যে প্রোথিত রয়েছে এর মূল এবং তা আমাদের ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একজন প্রতীচ্যবাসী খৃষ্টান হিসাবে আমি যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি ইকবাল কি সূত্রে আমার অন্তরের কাছে সরাসরি এসে দাঁড়ান, তার জবাবে আমি বলবো ঃ তা হলো, উদাহরণতঃ, ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ উপলক্ষে রচিত তাঁর কবিতার কশাঘাত। এ তিরস্কার আমার কাছে অতি স্পষ্ট ও প্রখর ঃ

পাশ্চাত্যের এই গৃধ্রকুলের এখনও জানবার বাকী রয়েছে
আবিসিনিয়ার শবদেহে কত হলাহল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।
হায় ! চার্চ-এর প্রোজ্জ্বল মহিমার কী পরিণতি !

ইকবাল ১৯৩৮ সালে পরলোকগমন করেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁর বেশ স্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল তাঁর সমকালে মানবজাতির জন্যে কি কি দুঃখ ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় রয়েছে। উপরি-উদ্ধৃত বাণীতে তাঁর যে কঠোরতা আত্মপ্রকাশ করেছে, তা যুক্তিযুক্ত ছিল বলেই মনে করতে হবে।

আমাদের স্মরণীয় যে, ইকবালের মূল প্রচেষ্টা খৃষ্টানদেরকে একটা অধিকতর সততাপূর্ণ এবং সৃজনশীল আত্মবিশ্লেষণের দিকে আহবান করার ব্যাপারে ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল মুসলমানদেরকে আত্মপ্রসাদ ও স্বপ্নমধুর পরজগত বিহারের বদভ্যাস থেকে মুক্ত করবার ব্যাপারে। খৃষ্টানদের প্রতি তাঁর-তীক্ষ্ণধার ছুরিকা যে মাঝে মাঝে এগিয়ে আসতো, তার কার্যকারিতা থেকে। আমি বুঝতে পারি, তিনি যখন সর্বপ্রচেষ্টায় এবং তুলনাহীন নৈপুণ্যের সাথে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি সঠিক লক্ষ্যে তীর ছুঁড়েছেন, তখন তা কত বেশী প্রাণস্পর্শী হয়ে থাকবে। তিনি যখন বলেন "আমার কথা শোনো !", তখন তিনি সাধারণতঃ বোঝাতে চেয়েছেন যে, একথা তাঁর শ্রোতাদেরকে আঘাত হানবে ; কিন্তু সাথে সাথে তিনি এ সান্ত্বনাও দিয়েছেন যে, এ আঘাত বিরূপাত্মক নয় ; কেননা, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে সততাপূর্ণ ও সৃষ্টিধর্মী জীবন স্পন্দনের উদ্বোধন করা।

এখন মেসজিদ-ই-কার্দোভা' কবিতাটির দিকে লক্ষ্য করে আমরা বলতে পারি যে, এর প্রাঞ্জলতা যে কোন পাঠককে তৎক্ষণাৎ বিমুগ্ধ করবে। যাহোক, যদিও ইকবাল কি বলতে চাচ্ছেন তা বুঝতে আমাদের একটুও বিলম্ব হয়

না, তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁর কবিতার ভাষার মূল রয়েছে উর্দু ও ফার্সী কাব্যের সুদীর্ঘ এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে। ইকবালের রূপকল্পের সম্পূর্ণ সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যায়নের দাবী কেউ করতে পারে নি; এ অক্ষমতা ততখানি অধিক করে দেখা দেয় তাঁদের কাছে যাঁরা ইসলামী সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সাথে যত বেশী পরিচিত।

কাল-কে তিনি উপমিত করেছেন 'দু'রঙিন পশমী সুতো'-র সাথে। এ একটি জটিল উপমা বটে। ডক্টর অ্যান মেরী শিমেল মন্তব্য করেছেন যে, কাল সম্বন্ধে এ কল্পনা—অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা কালকে দু'টি ভিন্ন রং-এ রঞ্জিত করেছেন, এ ধারণা—পুরাতন ইরানীয় ভাবধারার সাথে মিলে। এ ধারণা অনুসারে কালের দ্বার্থবোধক রূপকে কল্পনা করা হয়েছে এমন একটি স্বেচ্ছাচারী অস্তিত্ব বলে যা মানুষের প্রচেষ্টার প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করেই তাকে পুরস্কৃত বা নিগৃহীত করতে দেখা যায়। সূফী কবিতা এবং প্রাক-ইসলামী আরবী কবিতাতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে; এসব ক্ষেত্রেও মানুষের জীবনের অদ্ভুতত্ব নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ক্ষুধা ও আহার, তৃষ্ণা ও পানীয়, জীবন ও মৃত্যু জীবের কাছে এমন নির্বিচারে আসে যে, তার নিয়ন্তার কোনো খোঁজই পাওয়া সাধ্যাতীত।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইকবাল প্রচলিত উপমা ও প্রতীক অনেক ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তা পূর্বেকার ব্যবহারের পুনরুক্তি মোটেই নয়। তাঁর প্রতিভার অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরাতন ভাবাদর্শের নতুন অন্তর্দৃষ্টির আলোকে স্বচ্ছন্দ বর্ণনায়। দ্বিবর্ণ-সূত্রের ব্যাপারেও তিনি কালগর্ভে অন্ধ ও নিয়মবর্জিত ঘটনাবলীর দ্বারা আরোপিত মানুষের সুখ-দুঃখ সূত্রের অজ্ঞেয়তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে যাননি; বরঞ্চ তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, কালের এই অবোধ্যতাই হলো মানুষের কৃতিত্ব পরিমাপের কষ্টিপাথর। কালচক্রের নিষ্ঠুর বিবর্তনে কত মানুষের কত সাধনা বিফল হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কাল-প্রসারের এক একটি বিন্দুতে, কালের এই ধ্বংসক্ষমতাকে উপেক্ষা করে মানুষের কীর্তি সুসম্পন্নতা ও আত্মমর্যাদাগুণে ভাস্বর হয়ে—কালজয়ী হয়ে—দেখা দিয়েছে। ইকবালের দৃষ্টিতে মসজিদ-ই-কর্দোভা তেমন একটি কীর্তি। তাঁর ভাষায়, এ মসজিদ এমন একটি সৃষ্টি যার পরিপূর্ণতা প্রেমের দীপ্তিতে এখনও সমুজ্জ্বল।

দৈনিকের পাতা থেকে

ইকবাল দিবস

মহাকবি আল্লামা ইকবালকে আমাদের দেশে অনেকেই শুধু পাকিস্তানের কবি বলে মনে করতে পারেন, যে কথা ইকবাল দিবসে টিএসসির আলোচনা সভায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কবি ইকবাল কি শুধু পাকিস্তানেই সম্মানিত? কবি ইকবাল ও জিন্না সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই নিবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ইকবাল সম্পর্কিত সব রচনাবলীতে এবং জিন্না সম্পর্কিত অধিকাংশ রচনাবলীতেই তাদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য থাকে। এই সবপ্রবন্ধ নিবন্ধের রচয়িতা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই আছেন।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ভারতের ভুপালে কবি ইকবালের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত একটি পার্কে তার কবিতায় বিমূর্ত দুর্দমনীয় প্রতিরোধ স্পৃহার প্রতীক হিসাবে একটি বাজপাখীর ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। এর পরিকল্পনাবিদ ছিলেন একজন দক্ষিণ ভারতীয়। এরই বিপরীতে বাংলাদেশে কবি ইকবালের সঠিক স্বীকৃতি প্রদান ও মূল্যায়ন অনুপস্থিত। কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ইকবাল হলকে পুনরার স্বনামে ফিরিয়ে আনা উচিত এবং সার্জেন্ট জহিরুল হকের নামে নতুন কোন হলের নামকরণ করা যেতে পারে।

মাসুদ আহমেদ
ঝিকাতলা, ঢাকা।

আগামীকাল কেমন যাবে?

আগামীকাল কেমন যাবে নিশ্চিত করে এ কথা কেউই বলতে পারেন না।

সে কারণেই আপনার প্রয়োজন আগামীকালের যে কোন বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা।

আর সে প্রস্তুতির জন্যে অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে সেই পরামর্শ দিই প্রতি মুহূর্তে।

আগামীকালের প্রয়োজন মেটাতে
আজ থেকে আমরা তৈরী হয়ে আছি।
আগামীকালের জন্যে আজকের ব্যাংক।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত

অর্থনৈতিক মুক্তি
ও সমৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য

ইসলামী ব্যাংক
বৈদেশিক বাণিজ্যসহ
সকল প্রকার ব্যাংকিং লেনদেন এবং
ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও রিয়েল এস্টেটসহ
বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে

ইসলামী ব্যাংকের
সকল লেনদেন ও বিনিয়োগ
সম্পূর্ণ সুদমুক্ত

আপনার ও জাতির সেবায় নিয়োজিত

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত।

দীর্ঘস্থায়ী ফিলিপস বাল্ব-এর সমারোহ থেকে আপনার পছন্দমতো বাল্ব বেছে নিন!

স্বচ্ছ, ঘোলা বা আর্জেণ্টা যে কোন বাল্বই হোক না কেন—সঠিক ওয়াটের সঠিক বাল্ব আপনাকে দিতে পারে কেবলমাত্র ফিলিপস্। ২৫ থেকে ৩০০ ওয়াট পর্যন্ত বাল্ব-এর মধ্য থেকে আপনার প্রয়োজনীয় ওয়াট বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে একমাত্র ফিলিপস্ বাল্ব-এর বেলায়।

ফিলিপস্ আপনাকে 'শুধু অধিকতর উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থায়ী বাল্বই দেয় না উপরন্তু আপনার টাকার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে।

PHILIPS

আলোর ভুবনে
বিশ্বব্যাপী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপস

আল্লামা ইকবাল সংসদকে

জানাই

আন্তরিক অভিনন্দন

প্রফেসর হাওলাদার

(জ্যোতিষ বিজ্ঞানী)

১৮, নূরম্যানসন (দোতলা, গাউসিয়া মার্কেট-ঢাকা
ফোন ঃ ৫০১৪৪৯, ৫০৮৮৯৩
বিকাল ৫টা-৯টা শুধু মঙ্গলবার সকাল

জনতা হাউজিং লিমিটেড

১৫, শহীদ মিনার রোড
কল্যাণপুর, ঢাকা
ফোন ঃ ৩১৮৮২৪, ৩৮৬৫৩৩

প্রিয় প্লট গ্রহীতাগণ,

আপনারা যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ গ্রহণ করেছেন এবং যাঁরা ইতিমধ্যেই নিজস্ব জমির উপর বাড়ি তৈরী করেছেন তাঁরা সবাই আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আমরা শেরে বাংলা নগরে নতুন প্লট বরাদ্দ শুরু করেছি। শেরে বাংলা নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই অনুপম আবাসিক প্লটগুলোর ইতিমধ্যেই বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যাবতীয় নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন এই প্লটগুলি এখন আগে আসলে আগে পাবার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

নিজস্ব সুন্দর বাড়ি করার আপনার কল্পনার বাস্তব রূপ লাভ করুক—

এই আমাদের কামনা—

আবদুল কবির
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

IQBAL ACADEMY PAKISTAN Library LAHORE
30821

555
Stands out for taste
STATE EXPRESS
OF LONDON
Manufactured in Bangladesh
under authority of Ardath Tobacco Co. Ltd., London.
Tk. 24
For 20s

B-12

IQBAL ACADEMY PAKISTAN LIBRARY Acc. No. ...... LAHORE

আবেদন

'আল্লামা ইকবাল সংসদ'-এর তৃতীয় দফা কর্মসূচী হচ্ছে 'সংগ্রহ'। আর এর আওতায় আমরা একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছি। অধ্যয়ন এবং গবেষণা এ প্রয়াসের লক্ষ্য।

পুরনো, নতুন, আল্লামা ইকবালের যে-কোন ছবি, লেখা, বই, তাঁর ওপর যে-কোন প্রকাশিত লেখা আলোচনা, পর্যালোচনা, বই-স্মরণিকা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্যে তাই আমরা নিয়েছি বিশেষ কর্মসূচী।

আল্লামা ইকবালের স্মৃতি সংরক্ষণার্থে নিম্নঠিকানায় উপরোক্ত যে-কোন কিছু পেঁছালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

সভাপতি
আল্লামা ইকবাল সংসদ
১৮৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা-বাংলাদেশ।

"অনুভব"। (আল্লামা ইকবালের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত আল্লামা ইকবাল সংসদ স্মরণিকা)। প্রধান সম্পাদক ঃ মোঃ আঃ ওয়াহিদ। সম্পাদক ঃ জাফর আহমদ ভুঁইয়া। [illegible] ১৮৬, নবাবপুর রোড—ঢাকা থেকে প্রক[illegible] প্যাকেজিং লিঃ ২৩, যদুনাথ বসাক লেন, [illegible] ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ADDRESS: NAWAB PUR ROAD,
DHAKA—1, BANGLADESH.

00030821